ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

অগাস্ট

সন্দেশ

২০০৪

তৃতীয় প্রচ্ছদে পোস্টার

নাদিয়া কোমানিচি

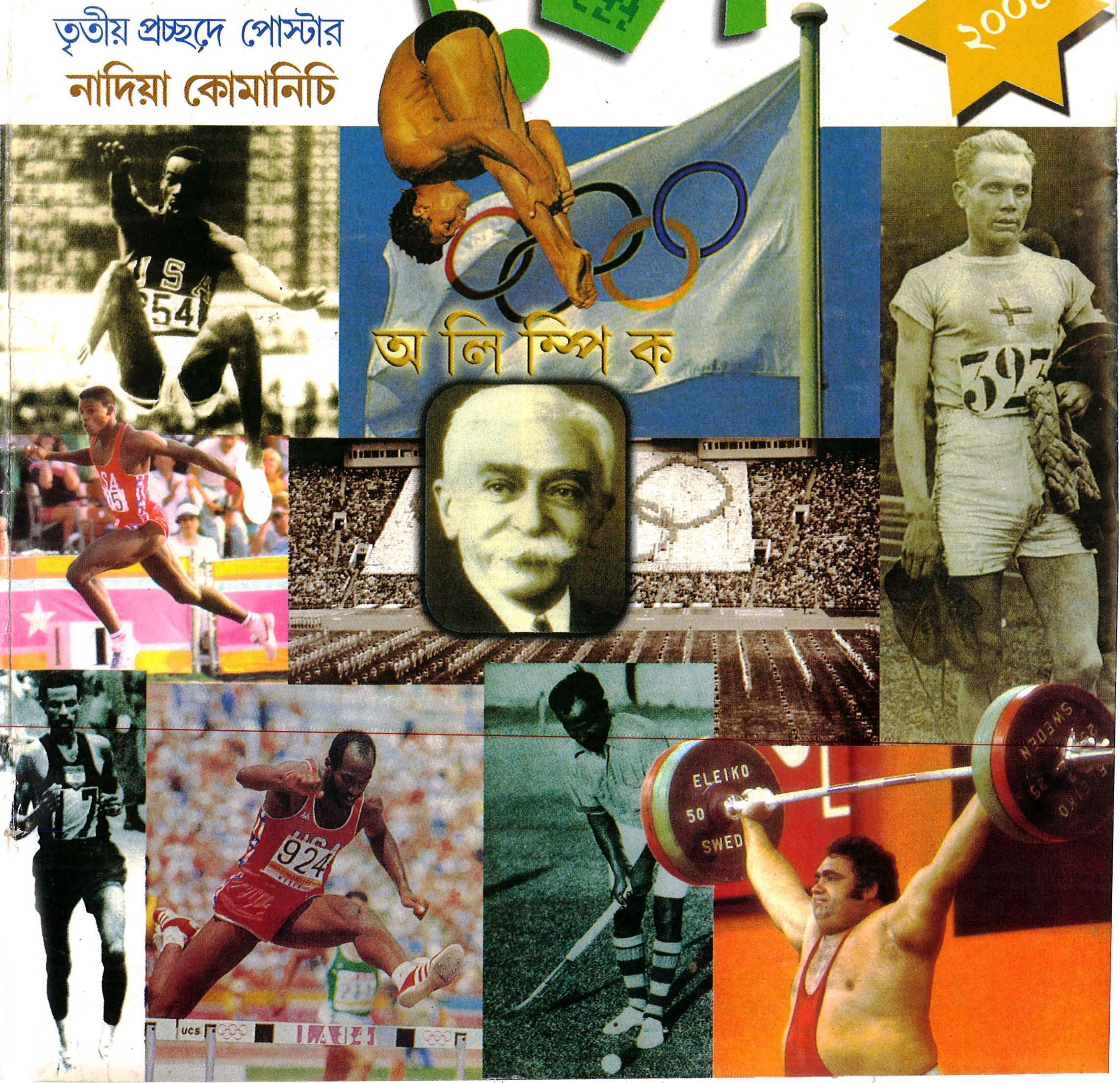

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ বিজয় বাসফোর

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

উন্নততর গ্রাহক পরিষেবার নতুন মাইল ফলক

- এখন দিনের ৯৬% সময়ে পর্ষদ কাঙ্খিত ৪৯.০ - ৫০.৫ ফ্রিকোয়েন্সিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।
- ২৪ ঘন্টার মেরামতি পরিষেবা চালু হয়েছে ১.১.০৪ থেকে ২৫ টি শিল্পাঞ্চলে।
- ১১১ টি সাপ্লাই-এ কম্প্যুটারে দ্রুত বিল জমা দেবার ব্যবস্থা আগস্ট ২০০৪ -এর মধ্যেই।
- জন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ৪.১২.০৩ থেকে ত্রিস্তর শুনানীর ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।
- ব্যাঙ্কের মাধ্যমে (ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস) বিল জমা দেওয়া শুরু হয়েছে ১.৭.০৩ থেকে বিধাননগরে।
- স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে বিল জমা দেওয়া শুরু হল ১.৭.০৪ থেকে বিধাননগর সাপ্লাই সাব-ডিভিশন-৩-এ।

WBSEB

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ● ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৪৩ ● অগাস্ট ২০০৪ ● শ্রাবণ ১৪১১

বিশেষ আকর্ষণ

হকির জাদুকর : নির্মলকুমার সাহা ৪
বুঝিয়ে বলা : দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৭
সিটিয়াস অলটিয়াস ফরটিয়াস : বল বয় ১২
অলিম্পিকের মজার ঘটনা : বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় ১৯
কয়েকজন অলিম্পিয়ানদের নিক্‌নেম : অজাতশ্মশ্রু ১৯
প্রথম অলিম্পিক ডাকটিকিট : গৌতমকুমার দে ২১
কিড্‌স গোয়ের্নিকা : অসিত পোদ্দার ২৩
চিত্রনাট্য : জয় বাবা ফেলুনাথ (ধারাবাহিক) ৫১

পুরোনো সন্দেশ থেকে

মানুষের ইতিহাস : মনীশ ঘটক ৫৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

যমুনাবতী : রাজা রায় ৩৮

গল্প

হারলেও হাসে : প্রচেত গুপ্ত ২৫
ছোট্‌কার নতুন বাড়ি : অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৬০
সাদাকালো ইসকুল : শুভশ্রী ভট্টাচার্য ৬৩

কবিতা

অলিম্ফিক ফিক্‌ : অমিতাভ চৌধুরি ৩
বৃষ্টির দিন : কালীকৃষ্ণ গুহ ৩৪
এ পথ দিয়েই : শৈলশেখর মিত্র ৩৪
ছোট হই যদি : রূপক চট্টরাজ ৩৪
ও ছড়া কোথায় গেল : চন্দন নাথ ৩৫

প্রবন্ধ

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একশো পঁচিশ বছর : ভূপতি চক্রবর্তী ৪৫
হৃদস্পন্দন ও মায়াসভ্যতা : তাপস ভট্টাচার্য ৪৭
নোটাফিলি সংগ্রহ : সৌভিক মুখোপাধ্যায় ৪৯

কার্টুন

গল্প বলার গল্প : সর্বজিৎ সেন ৩৭

কমিক্‌স

কমান্ডার বোস : গৌতম কর্মকার (ধারাবাহিক) ৩০
নন্দ গুপীর মন্দ কপাল : দিলীপ দাস ৬৬

বিভাগীয়

পাঁচ কথার প্যাঁচ : শুভেন্দু দাশমুন্সী ৪২
অঙ্কের মজা : স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী ৪৪
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর : জীবন সর্দার ৬৮
শব্দ-সন্ধান : বর্ণবণিক ৭২
ধাঁধা ৭২

হাত পাকাবার আসর ৭০
লেখা : ঋক্‌ ধর্মপাল, সুশ্রুত চক্রবর্তী, সুদীপ্ত নাগ

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

যুগ্ম সম্পাদক
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসাদরঞ্জন রায়

নির্বাহী সম্পাদক : সুমিতা সামন্ত

শিল্পনির্দেশনা : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিশেষ সহায়তায় : দেবাশিস সেন

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯৪/২/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড (ফেডারেশন হল তৃতীয় তল), কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত
স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড
কলকাতা ও শহরতলির পরিবেশক : **বিশাল বুক সেন্টার** ৪ টৌটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬

CESC LIMITED
ক্যাপ্টেন শক এবং সঙ্গী স্পার্ক
ক্যাপ্টেন শক
এই দ্যাখ, হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করা কত সোজা! এবার আমাদের ঘরে আলো জ্বলবে...আর পয়সাও দিতে হবে না।
চি-ড়-ড়-ড় চ্যাড়-ড়-ড়
কী মজা! এবার আমরা টিভি দেখবো, পাখার হাওয়া খাবো! চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা...
চিড়িক... চড়-ড়-ড়
কোথায় পালাবে, বাছারা—ক্যাপ্টেন শক-কে ফাঁকি দিয়ে?
না-আ-আ-আ! ওরে বাবারে এযে ক্যাপ্টেন শক
...যদি না পড়ো ধরা!
চিড়িক... পিড়িক...
হ্যাঁ স্পার্ক। বিদ্যুৎ চুরি আইনত অপরাধ। তার শাস্তি ৫ বছর অবধি জেল অথবা ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা দুটোই হতে পারে।
পুলিশ
চিড়-ড়-ড়-ড়-ড়
বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে তোমরাও আমাকে সাহায্য করো! বিদ্যুৎ চুরির খবর দিতে ১৯১২-তে ফোন করো!

অলিম্ফিক ফিক্

অমিতাভ চৌধুরি

ক্রিকেট এবং হকি ছাড়া
খেলার মাঠে কালব্যাধি,
সেই ব্যাধিকে বাগে আনতে
তৈরি সুরেশ কালমাদি
পাতে দেওয়ার যোগ্য ছিল
উষা এবং মিলখা সিং,
মালেশ্বরী, তাও কিছুটা—
অন্য রোগা টিং টিং।

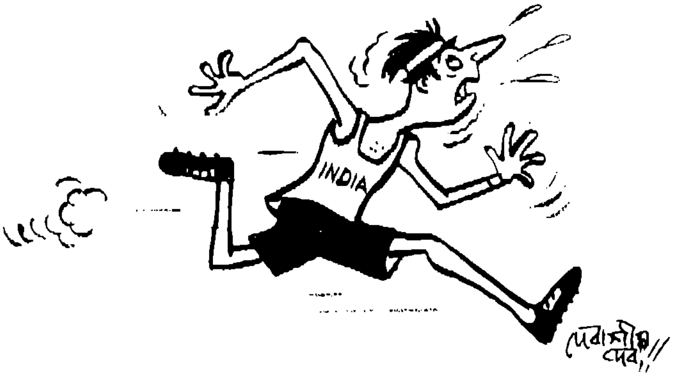

পালিয়ে যাবার দৌড়ে দাদা
পারদর্শী আমরা ঠিক,
অলিম্পিক তো আসবে যাবে
হাসব সবাই ফিক্ ফিক্।

ছবি : দেবাশীষ দেব

হকির জাদুকর

নির্মলকুমার সাহা

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক। অনেকে বলেন, হিটলারের অলিম্পিক। এ নিয়ে আস্ত একটি বইও রয়েছে ডাফ হার্ট-ডেভিসের 'হিটলার্স অলিম্পিক'। আমেরিকানরা অবশ্য বলেন, জেসি ওয়েন্সের অলিম্পিক। এ নিয়েও আছে একটি ভালো বই। জন ডেভিডসনের 'ওয়েন্সেস অলিম্পিক'। কোনও বই লেখা না হলেও, বার্লিনে অলিম্পিককে আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি, ধ্যানচাঁদের অলিম্পিক।

এখন আছে কিনা জানা নেই, তবে ১৭ বছর আগে ঝাঁসির প্রেমগঞ্জে ধ্যানচাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম একটি ছবি। ভারতের জার্সি গায়ে অলিম্পিকের সোনার পদক গলায় হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ধ্যানচাঁদ। পাশে তাঁর কাঁধে হাত রেখে অ্যাডলফ হিটলার। এবার, এথেন্সে অলিম্পিক শেষে হবে ২৯ অগাস্ট। আর সেইদিনই ভারত জুড়ে শুরু হবে হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

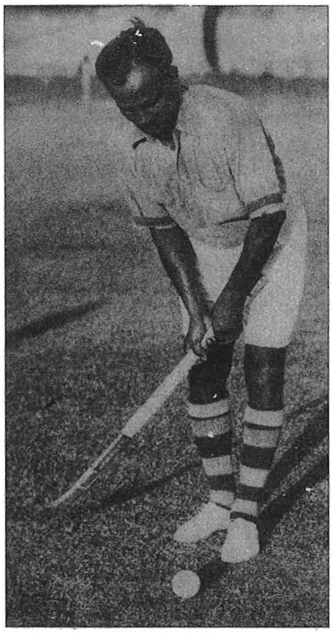

'রাজপুত' সুমের সিং চাকরি করতেন মিলিটারিতে। তাঁর তিন ছেলে মূল সিং, ধ্যান সিং এবং রূপ সিং। মেজ ছেলে ধ্যানের জন্ম ১৯০৫ সালে ২৯ আগস্ট, এলাহাবাদে। চাকরিসূত্রে সপরিবারে সুমের তখন এলাহাবাদেই ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাবার পথ ধরে ধ্যানও যোগ দেন মিলিটারিতে। গ্রামের মাঠে প্রথম হকি স্টিক হাতে নিলেও, হকিকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা চাকরি করতে এসেই। দিল্লির প্রথম ব্রাহ্মিণ রেজিমেন্টে সিপাই হিসাবে চাকরি জীবন শুরু ধ্যানচাঁদের। পরিবারে তখন লেখাপড়ার বিশেষ চলন ছিল না। পরিবারের বড়োরা ভাবেন নি, তিনি নিজেও লেখাপড়ার কথা বিশেষ ভাবেননি। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েই স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেন। পরে তিনি বলেছেন : আমি এরকমই একজন মানুষ, অল্প কিছু লিখতে পারি। পড়তেও পারি সামান্য। এর বেশি জ্ঞান নেই।

কিন্তু এতে কোনও ক্ষতি হয়নি ধ্যান সিং বা পরবর্তীকালের ধ্যানচাঁদের। ধ্যানচাঁদ প্রথম ব্রাহ্মিণ রেজিমেন্টে যোগ দেন ১৯২২ সালের গোড়ায়। এদেশের হকির বয়স তখন মাত্র ৩০ বছর। গল্পটার বেশি প্রচলন তখন সেনাবাহিনীতেই। শোনা যায়, ধ্যানচাঁদের বাবা সুমের সিং-ও সেনাবাহিনীতে টুকটাক হকি খেলতেন। সেটাকে হকির সঙ্গে পরিবারের রক্তের সম্পর্ক বলা যায় কিনা, কে জানে। তবে বাবা নন, ধ্যান সিংকে 'হকি প্রতিভা' হিসাবে প্রথম ব্রাহ্মিণ রেজিমেন্টে আবিষ্কার করেছিলেন মেজর বালে তেওয়ারি।

ধ্যানচাঁদের শিশু বয়সের হকি প্রেম নিয়ে অন্য একটি গল্পও অবশ্য শোনা যায়। ধ্যানচাঁদের বয়স তখন ১৪ বছর। বাবার হাত ধরে ইংরেজ অফিসারদের নিয়ে গড়া দুটি সামরিক দলের হকি ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন। একটি দল তখন ৬ গোলে পিছিয়ে। ধ্যানচাঁদ বাবাকে বলেন : 'আমাকে একটি স্টিক দিলে এখনই মাঠে নেমে পিছিয়ে থাকা দলটিকে জিতিয়ে দিতে পারি।' ছেলের কথা গুরুত্ব পায়নি বাবার কাছে। ছেলের কাকুতি মিনতি কিন্তু চলতেই থাকে। পাশেই ছিলেন এক সেনা অফিসার তিনিও ধ্যানচাঁদকে বলেন: 'হকি খেলার পক্ষে তোমার বয়সটা খুবই কম।' এরপর শুরু হয় ধ্যানচাঁদের কান্না। অতঃপর সেই অফিসার স্টিক তুলে দেন ধ্যানচাঁদের হাতে। মাঠে নেমে চারটি গোল করে পিছিয়ে পড়া দলটিকে জেতান ধ্যানচাঁদ। মুগ্ধ সেই সেনা অফিসার বলেছিলেন: 'বাচ্চা প্ল্যাটুন'। হকি খেলে জীবনের প্রথম প্রশংসা পাওয়া। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য হকি খেলে

বিশ্বজুড়ে বিস্তর খ্যাতি কুড়িয়েছেন। নানা বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। চাঁদের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে। তাই তিনি ধ্যান সিং থেকে হয়েছেন ধ্যানচাঁদ। আর্টিস্ট, 'ব্ল্যাক জুয়েল', 'হিউম্যান ইল'— কত বিশেষণ! এসবকে ছাড়িয়ে তিনি 'হকির জাদুকর'।

১৯২৬ সালে ভারতীয় আর্মি দল গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড সফরে। ওই সফরেই ধ্যানচঁদের খ্যাতি, যশ ছড়িয়ে পড়ে। সেই সফরে ১৯২ টি গোলের অধিকাংশই এসেছিল ধ্যানচাঁদের স্টিকে বা কৃতিত্বে। এর ২ বছর পরই ছিল অলিম্পিক। মূলত ওই সফরের সাফল্যই ভারতীয় হকির কর্তাদের উদ্বুদ্ধ করে অলিম্পিকে দল পাঠাতে। ১৯২৮ সালে আমস্টারদামে অলিম্পিকের আসরেও দর্শকদের মুগ্ধ করে আসেন ধ্যানচাঁদ। তারপর তিনি খেলেছেন আরও দুটি অলিম্পিকে। ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলেসে এবং ১৯৩৬ সালে বার্লিনে। শেষবার বার্লিনে ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। লেখার অপেক্ষা রাখে না, ওই তিনটি অলিম্পিকেই ভারতীয় হকি দল সোনা জিতেছিল। বার্লিন অলিম্পিক নানা কারণে ধ্যানচাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে ছিল। বার্লিনেই অলিম্পিক হকির সোনা জয়ে ভারত হ্যাটট্রিক করে। বার্লিনে ধ্যানচাঁদই ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। ওখানেই তিনি 'হকির জাদুকর' আখ্যা লাভ করেন। অবশ্য আমস্টারডাম অলিম্পিকের সময়ই ওখানকার 'জাজ' পত্রিকা ধ্যানচাঁদের হকি শিল্পকে জাদু সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিল : 'এ তো হকি খেলা নয়, এ যেন জাদু!'

বার্লিন অলিম্পিকে ভারতের সোনা জেতার পর হিটলার জানতে চেয়েছিলেন ধ্যানচাঁদের কাছে, 'আপনি কী করেন?' সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকের কাজ করেন ধ্যানচাঁদ। এটা শুনে বিস্মিত হিটলার বলেছিলেন, 'জার্মান সেনাতে থাকলে আমি আপনাকে মেজর বানিয়ে দিতাম।' পরে অবশ্য ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে 'মেজর' হিসাবেই অবসর নিয়েছিলেন হকির জাদুকর।

বার্লিন অলিম্পিক ছাড়াও ধ্যানচাঁদ ভারতীয় হকি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৯৩৪ সালে পশ্চিম এশীয় ক্রীড়াতে। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় হকি দল অলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসাবে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে। সেখানেও নেতৃত্বে ছিলেন ধ্যানচাঁদ। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব আফ্রিকা সফরে গিয়েছিল ভারত। সেখানেই শেষবার ভারতের জার্সি পরে খেলেন ধ্যানচাঁদ এবং অধিনায়কও ছিলেন তিনিই। ১৯৩৫ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ধ্যানচাঁদের দেখা হয়েছিল স্যার ডন ব্রাডম্যানের সঙ্গে। ২ মে ডনের শহর এডিলেডে পৌঁছয় ভারতীয় দল। সিটি হলে আয়োজন করা হয়েছিল সংবর্ধনা সভার। সেখানে এডিলেডের মেয়রকে পঙ্কজ গুপ্ত জানান, ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ডন ব্রাডম্যান তখন শহরেই ছিলেন। মেয়র অনুরোধ জানিয়ে বার্তা পাঠান তাঁকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই নাগরিক সংবর্ধনায় হাজির হন ডন ব্র্যাডম্যান। ধ্যানচাঁদ লিখেছেন :

> ব্র্যাডম্যানকে সেখানে দেখে আমরা খুব উৎফুল্ল হয়েছিলাম। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে ছবিও তুলি আমরা। সেই ছবিটি আমার জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছবির একটি।

সেদিন বিকেলেই এডিলেডের ক্রিকেট মাঠে

১৯২৮ অলিম্পিকে ধ্যানচাঁদ গোল করছেন

১৯৩৬ বার্লিন অলিম্পিকে সোনা জয়ী ভারতীয় দল (নীচে মধ্যে ধ্যানচাঁদ)

ধ্যানচাঁদরা খেলেছিলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ধ্যানচাঁদরা জিতেছিলেন ১০—১ গোলে। দর্শক আসনে ছিলেন স্যার ডনও। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম দেখা হকি ম্যাচ । তিনি মন্তব্য করেছিলেন : 'ভারতীয়রা তো ক্রিকেটের মতো স্কোর করছে!'

ছোটবেলা থেকেই হকির জাদুকরের হবি ছিল শিকার করা, মাছ ধরা। ঝাঁসি তখন খুব সাজানো শহর। আগে তা ছিল না। ধ্যানচাঁদের স্ত্রী জানকী দেবী তখন বেঁচে। একবার ঝাঁসিতে গিয়ে জানকী দেবীর মুখেই শুনেছিলাম:

> আমার বিয়ের অনেক পরেও চারিদিকে অনেক জঙ্গল ছিল। ছিল পুকুরও। মিলিটারির চাকরি, খেলা, পরে কোচিং— সব মিলিয়ে ঝাঁসির বাইরেই কাটিয়েছে বেশি সময়। কিন্তু যখনই প্রেমগঞ্জের এই বাড়িতে এসেছে, বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়েছে বনে-জঙ্গলে। কখনও আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা যড়শি হাতে কটিয়েছেন পুকুরের ধারে।

একবার কলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরের মানুষও ধ্যানচাঁদের মাছ ধরার আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেটা ১৯৬৯ সাল। তখন কলকাতা পুলিসের ডি সি (হেড কোয়ার্টার্স) ছিলেন এম এন বসু। তিনি ছিলেন ধ্যানচাঁদের খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁরই আমন্ত্রণে ধ্যানচাঁদ এসেছিলেন ব্যারাকপুরে। মাছ ধরারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই। সকাল ৮ টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত একটানা ছিপ-বড়শি নিয়ে বসেছিলেন পুকুরের ধারে। দুপুরের খাবার সাজানোই পড়েছিল। মাছ না ধরে তিনি ছিপ হাত থেকে নামাতে রাজি ছিলেন না। এরকমই ছিল তাঁর আন্তরিকতা।

হকি খেলা সম্পর্কে ধ্যানচাঁদ লিখেছেন :

> আমার মনে হয় না, হকি ছাড়া অন্য কোনও খেলায় মানুষের চিন্তা-শক্তির এমন সৌন্দর্যময় প্রয়োগ ঘটেছে। আমি যেদিন এই সুন্দর খেলাটি খেলতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই এর উপাসক।

সেদিন থেকে হকিই আমার ধর্ম। শেষ বয়েসে অবশ্য হকির প্রতি কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সেটা ক্ষোভ, হতাশায়। অনেককে বলতেনও তাঁর ক্ষোভের কথা। ক্ষোভ, অভিমান, হতাশা ছিল। কিন্তু তাঁর হৃদয় থেকে কি সত্যি হকি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল! মনে হয়, না। তিনি কখনও তাঁর 'ধর্ম' বিসর্জন দেননি। ১৯৭৯ সালে ৩ ডিসেম্বর ভোর ৪টে ২৫ মিনিটে বিশ্বহকির চিরশ্রেষ্ঠ নায়ক যখন রাজধানীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখনও তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'গো-ও-ল'!

বুঝিয়ে বলা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

অগাস্ট মাস জুড়ে চলবে অলিম্পিকস্। টেলিভিশনের চ্যানেলে চ্যানেলে অলিম্পিকস্ আর অলিম্পিকস্। প্রথম দিন শুধু উদ্বোধন। আসল খেলা শুরু পরের দিন থেকে। সবকিছুর মতোই অলিম্পিকস্ও উপভোগ করতে হলে খেলাধূলার বিবরণ— নিয়মকানুন খানিকটা জানা দরকার। নইলে পুরো মজাটা পাওয়া যাবে না। অনেক খেলার নিয়ম আমাদের জানাই আছে। যেমন, ফুটবল, হকি, ভলিবল, ওয়াটারপোলো ইত্যাদি। কিন্তু অলিম্পিকের ২৪টা বিষয়ের সবগুলোর নিয়মকানুন আমাদের কারুরই জানা নেই। সেই অপরিচিত, অল্পপরিচিত বিষয়গুলোকেই এখানে একটু 'বুঝিয়ে বলা' হল। 'বুঝিয়ে বলা' মনে আছে তো?

'বলছিলাম কি বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে
অর্থাৎ কি না লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে...'।

অ্যাথলেটিকস্

অলিম্পিকে শুধু দৌড় প্রতিযোগিতাই ১৫ রকমের। মাঠের ধারে আটজন প্রতিযোগীর দৌড়নোর জন্যে আলাদা রাস্তা বা 'লেন' নির্দিষ্ট করা থাকবে। এক পাকের দূরত্ব ৪০০ মিটার। ১০০ মি, ১০০ মি 'হার্ডলস' এবং ১১০মি 'হার্ডলস্' দৌড়তে হয় সোজা। ৪০০মি ও ৮০০ মি যথাক্রমে এক পাক ও দু'পাক। ১,৫০০মি হচ্ছে স্টেডিয়ামের ৩ ৩/৪ পাক, ৩,০০০ মি. সাড়ে ৭ পাক, ৫,০০০ মি মানে ১২ ১/২ পাক এবং ১০,০০০ মি. হচ্ছে ২৫ পাক। ম্যারাথনের দূরত্ব ৪২,১৯৫মি বা ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। প্রত্যেক দৌড়ের আগে স্টার্টার তার মাতৃভাষায় ঘোষণা করেন 'অন ইয়োর মার্কস'। ১০০, ২০০ আর ৪০০ মিটার দৌড়ে এরপর সেই ভাষাতেই বলা হয় 'সেটস্'। শেষে পিস্তলের আওয়াজে শুরু হয় দৌড়। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ভুল-শুরু বা 'ফলস্ স্টার্ট'-এর জন্যে একবার সতর্ক করে দেওয়া হয়, দুবারে তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে বুকের উচ্চতায় ফিতে টাঙানো থাকে। প্রতিযোগীদের হাত, পা এবং মাথা ছাড়া শরীরে যে কোন অংশ দিয়ে সেই ফিতে ছুঁয়ে দৌড় শেষ করতে হয়। ম্যারাথন ছাড়া এক সঙ্গেই মোট আট জন পর্যন্ত দৌড়তে পারেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা লেন নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেকে তাঁর নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়েই চলতে বাধ্য। সেকেন্ডের ১০০ ভাগের ১ ভাগ ক্ষুদ্রাংশ সময় মাপা হয় ১০,০০০ মি পর্যন্ত সব কটা দৌড়ে। ১০,০০০ মিটারের ওপরে সব দৌড়ের জন্যে সেকেন্ডের ১০ ভাগের এক ভাগ এবং ম্যারাথনের জন্যে পূর্ণ সেকেন্ড গণনা করা হয়।

হাঁটার প্রতিযোগিতা আছে দু-রকম দূরত্বের। ২০ আর ৫০ কিলোমিটার। প্রতিযোগীকে লক্ষ রাখতে হয় হাঁটার সময় যেন দু-পায়ের কোন না কোন পায়ের সঙ্গে মাটির যোগ থাকে।

চার রকম দূরত্বের 'হার্ডল' রেসে সব সময়ই মোট ১০টি করে হার্ডল বা বেড়া টপকাতে হয়। তবে দূরত্ব অনুযায়ী বেড়ার উচ্চতার রকমফের হয়। পুরুষদের ১১০মি দৌড়ে হার্ডলের উচ্চতা ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি, ৪০০ মিটাতে৩ ফুট। মহিলাদের ১০০ মিটারে ২ ফুট ৯ ইঞ্চি ও ৪০০ মিটারে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। দৌড়ের সময় পা লেগে বেড়া পড়ে গেলে কিছু যায় আসে না, আগে পৌঁছনোটাই বড় কথা। আসলে বেড়ায় পা লাগলে দৌড়াবার গতি কমে যায়। পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে ২৮টা বেড়া টপকে ও ৭টা জলের বাধা পেরিয়ে ফিতে ছুঁতে হয়।

'থ্রোয়িং' বা ছোঁড়া : অলিম্পিকে মোট চার ধরনের ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা আছে। 'শট' (লোহার বল), ডিসকাস (গোল চাকতি), জ্যাভলিন (বর্শা) আর হ্যামার (বিশেষ রকমের হাতুড়ি)। পুরুষদের জন্যে 'শট', 'ডিসকাস', 'জ্যাভলিন' ও 'হ্যামার'-এর ওজন যথাক্রমে ৭.২৬ কিগ্রা, ২ কিগ্রা, এবং ৭.২৬ কিগ্রা। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি ওজন যথাক্রমে

৪ কিগ্রা ১ কিগ্রা এবং ৬০০ গ্রাম। 'হ্যামার' কেবল পুরুষদের জন্যে। প্রত্যেকে তিনবার করে ছোঁড়ার সুযোগ পান। এঁদের মধ্যে থেকে প্রথম ৮ জন ৩ বার অতিরিক্ত সুযোগ পান।

লাফানো (জাম্প) : লাফের প্রতিয়োগিতা চার রকমের : 'লং জাম্প', 'হাই জাম্প', 'পোল ভল্ট' আর 'ট্রিপল জাম্প'। ২০ সেমি. চওড়া 'টেক-অফ বোর্ড' থেকে লং জাম্প দিতে হয়। বালিতে লাফানোর পর শরীরের যে অংশ 'টেক-অফ-বোর্ড' থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বে দাগ কাটে সেখান থেকেই লাফের দৈর্ঘ্য মাপা হয়।

ট্রিপল জাম্পকে 'হপ-স্টেপ-অ্যান্ড-জাম্প'ও বলা হয়। এক পায়ে লাফানো শুরু করে অন্য পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে আবার শুরুর পা দিয়ে শেষ করতে হয়।

'হাই জাম্প' আর 'পোল-ভল্ট'-এর ক্ষেত্রে প্রথম স্থানাধিকারী যদি একাধিক হয়, তবে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যে যারা কমবার বাতিল হয়েছেন, তাঁকে বিজয়ী বলে মেনে নেওয়া হবে।

বক্সিং

জুডো, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং বা কুস্তি প্রতিযোগিতার মতো বক্সিং প্রতিয়োগিতাতেও শরীরের ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিভাগ থাকে। ১২ রকমের বক্সিং প্রতিটি ৩ মিনিটের রাউন্ড হিসেবে খেলা হয়ে থাকে। দুটি রাউন্ডের মাঝে থাকে ১ মিনিটের বিরতি। বিভাগগুলি হল : লাইট ফ্লাইওয়েট (৪৮ কিগ্রা পর্যন্ত), ফ্লাইওয়েট (৫১ কিগ্রা-র কম), ব্যানটামওয়েট (৫৪ কিগ্রা-র কম), ফেদার ওয়েট (৫৭ কিগ্রা-র কম), লাইটওয়েট (৬০ কিগ্রা-র কম), লাইট ওয়েল্টার ওয়েট (৬৩.৫ কিগ্রা-র কম), ওয়েল্টারওয়েট (৬৭ কিগ্রা-র কম), লাইট মিডল ওয়েট (৭১ কিগ্রা-র কম), মিডলওয়েট (৭৫ কিগ্রা-র কম), লাইট হেভিওয়েট (৮১কিগ্রা-র কম), হেভিওয়েট (৯১ কিগ্রা-র কম), সুপার হেভিওয়েট (৯১কিগ্রা-র বেশি)।

সাধারণত নক-আউট পদ্ধতিতে খেলার হারজিত ঘোষণা করা হয়, তবে রেফারি ইচ্ছে করলে খেলা বন্ধ করে প্রাপ্ত পয়েন্ট বিচার করে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করতে পারেন।

শুটিং

শুটিং মানে বন্দুক ছোঁড়া। তবে ঠিক বর্শা ছোড়ার মতো নয়। বন্দুকে গুলি ভরে ছুড়তে হয় সেইগুলি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে। তবে আমরা বলি বন্দুক ছোঁড়া আর গুলি করা। শুটিং প্রতিয়োগিতায় পুরুষদের বিভাগ ৭টি, মহিলাদের ৩টি বিভাগ। ফ্রি-পিস্তল প্রতিযোগিতায় ৫০মি. দূরত্ব থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ৬ দফায় ১০ বার করে মোট ৬০ বার গুলি করতে হয়। শায়িত অবস্থায় স্মল বোর রাইফেল বিভাগে ২ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ মি. দূরত্ব থেকে ৬০ বার গুলি করতে হয়। তিন রকম অবস্থানে স্মল-বোর রাইফেল (দাঁড়িয়ে, হাঁটু ভেঙে, শুয়ে) বিভাগে ওই আগের দূরত্বেই গুলি করতে হয় ৪ দফায় মোট ৪০ বার। র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল বিভাগে ২৫মি দূরত্বে ৫টি আলাদা আলাদা লক্ষ্যে মোট ৬০ বার গুলি করতে হয়। এক এক দফায় গুলি করতে হবে মোট ৫ বার, এর মধ্যে লক্ষ্য বস্তুর অবস্থান পাল্টাতে থাকে। লক্ষ্যবস্তু দেখা যায় ১ সেকেন্ডের ৫ ভাগের ১ ভাগ সময় ধরে।

রানিং গেম-এ ৫০ মি. দূরত্ব থেকে ৩ দফায় মোট ৩০ বার গুলি করতে হয়। লক্ষ্যবস্তুর চেহারা অনেকটা ছুটন্ত শুয়োরের মতো। লক্ষ্যবস্তু আড়াআড়ি ভাবে ১০মি. দৌড়োয় প্রথমে ৫ সেকেন্ডে, তারপর পুনরাবৃত্তির সময় মাত্র ২.৫ সেকেন্ডে।

ট্র্যাপ শুটিং-এ শট গান ছুঁড়ে মাটির চাকতি (ক্লে-সসার) ভাঙতে হয়। প্রতিযোগীর সংকেত পাওয়া মাত্র ১৫ মিটার দূরত্বের 'ট্র্যাপ' থেকে বিভিন্ন দিকে পাখির মত উড়ে যায় ওই মাটির চাকতি বা গেম-বার্ড। প্রত্যেক প্রতিযোগী ২০০টি গেম-বোর্ডে গুলি করার সুযোগ পান। এক লাইনে ৩.২০ মিটার পরপর ৫টি শুটিং স্টেশন থেকে গুলি করতে হয়।

স্কিট শুটিং-ও ওই মাটির চাকতি আর শট গানের ব্যাপার। তবে চাকতি ওড়ে এক জায়গার বদলে দু-জায়গা থেকে; কখনও আলাদাভাবে, কখনও এক সঙ্গেই। এখানে ও ছোঁড়া হয় ২০০টি চাকতি।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা জটায়ুর 'ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-------!' নয়।

ইকোয়েস্ট্রিয়ান

ইকোয়েস্ট্রিয়ান বা অশ্বারোহন প্রতিযোগিতায় তিনটি আলাদা আলাদা বিভাগ। প্রথমটি হচ্ছে গ্রাঁ প্রি বা ঘোড়ার লাফ। প্রথম রাউন্ডে ১০টা থেকে ১২টা সর্বোচ্চ ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির বেড়া টপকাতে হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে ১০টা বাধার উচ্চতা একটু বাড়ানো হয়। এর মধ্যে জলের বাধাও আছে। দ্বিতীয় বিভাগের নাম 'ড্রেসাজ'। এই বিভাগটি হল ঘোড়া আর তার আরোহীর সমঝোতা। তৃতীয়টি হচ্ছে 'থ্রি-ডেজ-ইভেন্ট'। এটি হচ্ছে ঘোড়া আর আরোহীর সহিষ্ণুতা নিয়ে, লাফানোর ক্ষমতা নিয়ে আর সমঝোতা নিয়ে। প্রত্যেকটা বিষয়েই আবার একক ও দলগত দু-রকম প্রতিযোগিতা হয়।

ফেনসিং

তলোয়ার খেলা। একক ও দলগত দু-রকমই হয়। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা প্রতিযোগিতা। পুরুষদের অস্ত্রের মান ও ব্লেড ৩ রকম; বিভাগও তাই তিনটে— ফয়েল, এপে আর সেবার। মহিলাদের শুধুই ফয়েল। পুরুষদের লড়তে হয় ৬ মিনিট, মহিলাদের ৩ মিনিট। প্রতিপক্ষের শরীরের নির্দিষ্ট অংশ স্পর্শ করতে হয় পুরুষদের ৫ বার, মহিলাদের ৪ বার। যিনি আগে করতে পারেন তিনিই জেতেন। পোশাকে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি লাগানো থাকে। পোশাকের সঙ্গে তলোয়ারের সংযোগ হওয়া মাত্র স্কোরবোর্ড দেখিয়ে দেয়।

জিমন্যাসটিকস্

পুরুষদের মোট ৮টি বিভাগ। ফ্লোর এক্সারসাইজ, পোমেল হর্স, রিংস, হর্স ভল্ট, প্যারালাল বারস্, হরাইজন্টাল বার ছাড়াও আছে মোট একক এক্সারসাইজ আর দলগত ফল।

মহিলা বিভাগের সংখ্যা ৬। হর্স ভল্ট, অ্যাসিমেট্রিক বারস্, ব্যালান্স বিম, ফ্লোর এক্সারসাইজ ছাড়াও মোট একক এক্সারসাইজ, দলগত ফল এবং সংগীতবহুল 'রিদ্‌মিক্ জিমন্যাসটিকস্'।

জিমন্যাসটিকসের ফুল মার্কস ১০। হাত, পা, মাথা ও শরীরের অবস্থান অনুযায়ী প্রতিযোগীদের নম্বর দেওয়া হয়।

মডার্ন পেন্টাথলন

অলিম্পিকের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতা পেন্টাথলন। এতে প্রতিযোগীর নানারকমের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হয় পাঁচটি আলাদা বিষয়ে। (১) জামিন : ১৫টার বেশি বাধা টপকে ৬০০ মি. দৌড়, (২) ফেনসিং বা তলোয়ার খেলা, (৩) ৯০০ মি. ফ্রিস্টাইল সাঁতার, (৪) ২৫মি. দূরত্ব থেকে পিস্তল শুটিং আর (৫) ৪০০০ মি. ক্রশ-কান্ট্রি দৌড়।

রোয়িং

দাঁড়টানা নৌকো চালানো প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগ ৮টি, মহিলাদের ৬টি। প্রত্যেক বিভাগেই পুরুষদের নৌকো বাইতে হয় ২,০০০ মিটার, আর মহিলাদের ১,০০০ মিটার। বিভিন্ন বিভাগে দাঁড়িয়ে সংখ্যা ১ থেকে ৮। তার মধ্যে কোনটা হাল (কক্স) ছাড়া, কোনটা আবার হাল সমেত।

সুইমিং

অলিম্পিকের ৫০ মিটার পুলে সাঁতার কাটা হয় মূলত চার রকমের। (১) ফ্রিস্টাইল, (২) ব্যাকস্ট্রোক, (৩) ব্রেস্টস্ট্রোক আর (৪) বাটারফ্লাই। যাকে 'মেডলি রেস' বলা হয় তা হল একসঙ্গে এই চারটি, প্রথমে বাটারফ্লাই, তারপর ব্যাকস্ট্রোক, তারপর ব্রেস্টস্ট্রোক আর সব শেষে ফ্রিস্টাইল। পুরুষদের প্রতিযোগিতা হয়: ফ্রিস্টাইল বিভাগে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার আর ১,৫০০ মিটার; ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক আর বাটারফ্লাই

বিভাগের প্রত্যেকটি ১০০ মিটার আর ২০০ মিটার। মেডলি বিভাগে একটাই প্রতিযোগিতা ৪০০ মিটার। এছাড়া পুরুষদের দলগত রিলে প্রতিযোগিতা। আছে ফ্রিস্টাইলে ৪ x ১০০ মিটার, ৪ x ২০০ মিটার, মেডলিতে ৪ x ১০০ মিটার।

মহিলাদের বিভাগে ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের পরিবর্তে ৮০০ মিটার সাঁতার কাটতে হয়। এছাড়া ৪ x ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে সাঁতারও মহিলাদের নেই। বাদবাকি সব পুরুষদের মতোই। অনেক পরে, ১৯৮৪-র লস এঞ্জেলস অলিম্পিক থেকে যুক্ত হয়েছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি নতুন বিভাগ সিনক্রোনাইজ্‌ড সুইমিং (দু-জনের)। টিভি-তে অলিম্পিক দেখার সময় এটি যেন অবশ্যই দ্রষ্টব্য তালিকায় থাকে।

ওয়েটলিফ্‌টিং

ভারোত্তোলন বিভাগে 'স্ন্যাচ্‌' আর 'ক্লিন অ্যান্ড জার্ক' এই দু-ভাবে ওজন তোলা যায়। স্ন্যাচ্‌- অর্থাৎ মাটি থেকে একেবারেই মাথার ওপরে তুলে প্রথমে কাঁধে, পরে হাত ও পায়ের জোরে মাথার ওপরে তুলতে হয়। দু-জন প্রতিযোগী যদি সমান ওজনের ভার তোলেন, তবে যাঁর শরীরের ওজন কম তিনিই জেতেন। শরীরের ওজন অনুযায়ী ৫২ থেকে ১১০ কিলোগ্রামের বেশি পর্যন্ত মোট ১০টি বিভাগ আছে।

রেসলিং

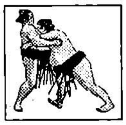

কুস্তি হয় দু-রকম পদ্ধতিতে। ফ্রিস্টাইল আর গ্রেকো-রোমান (পায়ের ব্যবহার সীমিত)। ৪৮ কিলোগ্রাম থেকে ১০০ কিলোগ্রাম বা তার বেশি শরীরের ওজন অনুযায়ী দুটি ক্ষেত্রেই ১০ রকম বিভাগ আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ৩ মিনিটের ৩টি রাউন্ডের প্রতিযোগিতা, ফলাফল হয় পয়েন্টে বা নক-আউটে।

ইয়াটিং

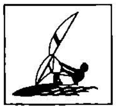

ইয়াটিং হল ছোট পাল তোলা হালকা ওজনের নৌকো চালানোর প্রতিযোগিতা। নৌকোর গঠন অনুযায়ী মোট ৭টি বিভাগ আছে। (১) ফিন— একজন নাবিকের নৌকো, (২) স্টার— ২৮১ বর্গফুট মাপের পাল যুক্ত এই নৌকোয় নাবিক থাকে দুজন, (৩) ফ্লাইং ডাচম্যান দুজন নাবিকের একজন নৌকোয় দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, (৪) টর্নডো সবচেয়ে দ্রুতগামী দুই নাবিকের নৌকো, (৫) ৪৭০-দুজন নাবিক দ্বারা চালিত ৪৭০ সেন্টিমিটার লম্বা নৌকা। (৬) সোলিং-তিনজন নাবিক চালিত নৌকো, (৭) বোর্ডসেলিং।

প্রতি বিভাগে মোট ৭টি করে দ্রুতগামী রেসে অংশগ্রহণ করতে হয়। আগে পরে আসার ভিত্তিতে পয়েন্ট দেওয়া হয় যথাক্রমে ১ম ০, ২য় ৩; ৩য় ৫.৭, ৪র্থ ৮ এমনি ভাবে। ৭টি রেস হবার পর যে নৌকো সবচেয়ে কম পয়েন্ট পায় তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

ডাইভিং

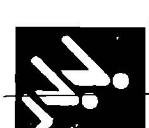

ডাইভিং দু-ধরনের : স্প্রিংবোর্ড আর হাইবোর্ড। স্প্রিংবোর্ড থাকে জলের ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি (৩ মিটার) ওপরে। এই বিভাগে বাধ্যতামূলক ৫টি ছাড়াও পুরুষেরা ৬টি এবং মহিলারা ৫টি ডাইভ দিতে পারেন। হাইবোর্ড থাকে জলের ৩০ ফুট ৫ ইঞ্চি (১০ মিটার) ওপরে। এই বিভাগে বাধ্যতামূলক ৪টি ছাড়াও পুরুষেরা ৬টি এবং মহিলারা ৪টি ডাইভ দিতে পারেন। নানারকমভাবে ডাইভ দেওয়া যায়, যেমন : ফরোয়ার্ড, ইনওয়ার্ড, রিভার্স, ব্যাকওয়ার্ড আর ফরোয়ার্ড-হাফ-টুইস্ট। প্রত্যেকটি ডাইভের জন্য ১.১ থেকে ৩.০ পর্যন্ত পয়েন্ট থাকে। এগুলিকে বলে 'ডিগ্রি অফ ডিফিকালটিজ'। বোর্ডে দৌড়নো থেকে শুরু করে জলে পড়া পর্যন্ত প্রতিযোগীর দেহের ভঙ্গী ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ০ থেকে ১০ অবধি পয়েন্ট দেওয়া হয়।

অলিম্পিক-ডাইভে বিচারক থাকেন ৭ জন। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পয়েন্ট দুটি বাদ দিয়ে মধ্যবর্তী পাঁচটি পয়েন্টের যোগফলের সঙ্গে 'ডিগ্রি অফ ডিফিকালটিজ-'এর গুণফলই হল প্রতিযোগীর প্রাপ্ত পয়েন্ট।

আর্চারি

ধনুক দিয়ে তির ছুঁড়তে হবে— *লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে তাক করে যায় তীরধনুকে।* অলিম্পিকে লাফ-টাফ দিয়ে তির ছোঁড়া যায় না। আর অলিম্পিকের ধনুক এক জটিল যন্ত্র। যেখানে বন্দুকের মতো লক্ষ্যবস্তুকে টিপ করার জন্যে 'মাছি'ও থাকে। আর্চারি প্রতিযোগিতায় পুরুষ আর মহিলা দুই বিভাগই আছে। পুরুষদের ৩০, ৫০, ৭০ ও ৯০ মিটার দূরত্ব থেকে তির ছুঁড়তে হয়। মহিলাদের বেলায় দূরত্বের মাপ ৩০, ৫০, ৬০ ও ৭০ মিটার। তির ছুঁড়তে হয় ৩৬টা করে দু-রাউন্ডে মোট ৭২টা। টার্গেট-বোর্ডে ১০টা সমকেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকা থাকে। একেবারে ভেতরের ছোট্ট বৃত্তে তির লাগলে ১০ পয়েন্ট পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে বাইরের বৃত্তে তির লাগলে পাওয়া যায় মাত্র ১ পয়েন্ট। সব কটা তির সবচেয়ে ভেতরের বৃত্তের মাঝখানে লাগলে পয়েন্ট পাওয়া যায় ২৮৮০।

ক্যানুইং

ছোট নৌকো চালানোর প্রতিযোগিতা। দাঁড়ের গঠন অনুযায়ী দু-ধরনের বিভাগ : কায়াক আর কানাডিয়ান। কায়াকের দাঁড় নৌকোর দুধারেই ব্যবহার করা যায়। চামচের দু-দিক দিয়েই জিনিস তোলা গেলে যেমন দেখতে হয়, কায়াকের দাঁড় দেখতে অনেকটা সেই ধরনের। কানাডিয়ান ক্যানু-র দাঁড় নৌকোর যে কোন একদিকে ব্যবহার করা যায়। ১ থেকে ৪ জন চালক এবং বিভিন্ন দূরত্ব অনুযায়ী কায়াক বিভাগে পুরুষদের ৫টি এবং মহিলাদের ৩টি প্রতিযোগিতা হয়। কানাডিয়ান বিভাগে কেবল পুরুষদের জন্য রয়েছে ৪টি প্রতিযোগিতা।

জুডো

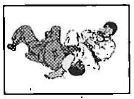

ওজন ভিত্তিক ৮টি বিভাগে জুডো খেলা হয়। খেলার নিয়ম হল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠিক পদ্ধতিতে ধরা এবং ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলা। তবে 'নট নড়ন্-চড়ন্' অবস্থায় ধরে রাখতে হবে ৩০ সেকেন্ড। প্রাথমিক রাউন্ড খেলার সময় ৬ মিনিট, সেমিফাইনালে ৮ মিনিট এবং ফাইনালের জন্যে বরাদ্দ থাকে ১০ মিনিট। রেফারি ছাড়াও জুডোয় আরও দুজন বিচারক থাকেন।

ডেকাথলন

গ্রীক শব্দ 'ডেকা' (অর্থাৎ দশ) থেকে এসেছে ডেকাথলন। পুরুষদের এই বিভাগে পর পর দুদিনে দশটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়। প্রথম দিনে থাকে ১০০ মিটার দৌড়, লংজাম্প, শটপুট, হাই জাম্প ও ৪০০ মিটার দৌড়। দ্বিতীয় দিনে থাকে ১১০ মিটার হার্ডলস্, ডিসকাস থ্রো, পোলভল্ট, জ্যাভলিন থ্রো ও ১৫০০ মিটার দৌড়। প্রত্যেকটি খেলার মান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পয়েন্ট থাকে। যেমন ১০০ মিটার ১০ সেকেন্ডে দৌড়োলে ১০৭৩ পয়েন্ট, ১০.১০ সেকেন্ডে ১০৪৪ পয়েন্ট, ১০.২০ সেকেন্ড ১০১৫...। লংজাম্পে ৮.৩৫ মিটার লাফালে ১০৮৭, ৮.৩০ মিটারে ১০৭৭...। তেমনি ৫৬.৮৯ মিটার ডিসকাস ছুঁড়লে ৯৯০, ৫৬.৫৯ মিটার ছুঁড়লে ৯৮৫ পয়েন্ট। ডেকাথলন বিজয়ীকে বলা হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট। মজার ব্যাপার হল অন্তত ৯ জন অলিম্পিক ডেকাথলন বিজয়ী পরে সিনেমার জনপ্রিয় তারকা হয়েছিলেন।

হেপ্টাথলন

আগে ছিল মহিলাদের পাঁচটি বিষয়ের পেন্টাথলন। পরে পাঁচটির সঙ্গে আরও দুটি বিষয় যোগ করে হয়েছে সাতটি বিষয়ের হেপ্টাথলন। পর পর দুদিনের প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে অংশ নিতে হয় ১০০ মিটার হার্ডলস্, হাইজাম্প, শটপুট ও ২০০ মিটার দৌড়ে এবং দ্বিতীয় দিনে লংজাম্প, জ্যাভলিন ও ৮০০ মিটার দৌড়ে। নম্বর বা পয়েন্ট দেওয়া হয় মান অনুযায়ী। যেমন : ১১.৮০ সেকেন্ডে ১০০ মিটার হার্ডলস দৌড়লে ১১৯৫ পয়েন্ট ১১.৮৫ সেকেন্ডে ১১৮৬, ১১.৯০ সেকেন্ডে ১১৭৭...। ১.৯৮ মিটার হাইজাম্পের জন্যে ১১৯৩, ১.৯৫ মিটারের জন্যে ১১৬৬ ইত্যাদি।

মোটামুটি জটিল নিয়মকানুনগুলো সংক্ষেপে এখানে বলে দেওয়া হল। এবার 'সন্দেশ' নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে পড়লেই হয়। তবে স্কুলের পড়াশোনা বাদ দিয়ে নয় অবশ্যই।

সিটিয়াস অলটিয়াস ফরটিয়াস

বল বয়

একশো আট বছর পরে আধুনিক অলিম্পিক ফিরে আসছে তার জন্মভূমিতে। ১৮৯৬ সালে এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম অলিম্পিক। তারপর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন শহর ঘুরে পচিশতম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আবার এথেন্সে।

প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিয়ায় : খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সালে গ্রিসের এলিস জনপদের রাজা ইফিটাস এই অলিম্পিকের সূচনা করেন। প্রথমে গ্রিক সভ্যতার হাতে যার সূচনা, পলোপোনেসিয়ান, হেলেনিক, প্যান হেলেনিক হয়ে তার সমাপ্তি ঘটল রোমান সভ্যতায়। ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট থিওডোসিয়াস-এর আদেশে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে ১১৬৯ বছর ধরে মোট ২৯২ বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল অলিম্পিক। একটি প্রতিযোগিতা শেষ হবার ৫২টি পূর্ণিমার পরে, অর্থাৎ চার বছর পরে অনুষ্ঠিত হত পরের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শুরুও হত এক পূর্ণিমাতে। এই চার বছরে বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হত দৌড়, ঝাঁপ, বক্সিং, মল্লযুদ্ধ, রথের দৌড়, ডিসকাস থ্রো ইত্যাদি প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন নগরের বিজয়ীরা সমবেত হতেন অলিম্পিয়ার মূল প্রতিযোগিতায়। অলিম্পিয়ার প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে উপহার দেওয়া হত জলপাই গাছের পাতার তৈরি মুকুট। খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬-এ অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিযোগিতার প্রথম বিজয়ী ছিলেন করিবাস। স্টেডিয়ামের যা দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ১৯৩ মিটার দৌড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন তিনি।

ব্যারন ও ব্যারনেস কুবার্তিন

আধুনিক অলিম্পিক ও কুবার্তিন : থিওডোসিয়াস অলিম্পিক বন্ধ করে দিলেন। তারপর সময়ের সাথে সাথে একসময় গ্রিক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল। হারিয়ে গেল অলিম্পিয়া, রোম ইত্যাদি শহরগুলি। ১৮৭৫ সালে একটি জার্মান প্রত্নতাত্বিক দল খুঁজে পেল প্রাচীন অলিম্পিয়াকে। অলিম্পিয়া আবিষ্কার উদ্বুদ্ধ করল একটি মানুষকে। তিনি ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন। ১৮৯২ সালে তিনি অলিম্পিক আবার শুরু করার প্রস্তাব দেন। এরপর বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেলেন অলিম্পিকের পুনপ্রবর্তনের। অবশেষে ১৮৯৪ সালে সফল হলেন ব্যারন। প্যারিসের সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে অলিম্পিক গেমস আবার শুরু হবে। প্রথম বছরের জন্য বেছে নেওয়া হয় এথেন্সকে। কারণ প্রাচীন অলিম্পিকের জন্মভূমি এই গ্রিস। ব্যারনের অবশ্য ইচ্ছে ছিল ১৯০০ সালে প্যারিসেই বসুক আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় ১৮৯৬ সালে এথেন্সেই শুরু হবে অলিম্পিক গেমস এর যাত্রা।

এথেন্স থেকে যাত্রা হল শুরু :১৮৯৬-এর ৫ এপ্রিল এথেন্সের পেনাথেনাইক স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল আধুনিক অলিম্পিকের। উদ্বোধনের বহু সময় আগে

থেকেই দর্শকরা সারিবদ্ধভাবে স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। বিকেল তিনটে তিরিশ মিনিটে ৬০,০০০ দর্শকের সামনে রাজা প্রথম জর্জ উদ্বোধন করলেন প্রথম অলিম্পিকের। রাজপুত্র কনস্ট্যানটাইন স্বাগত ভাষণ দিলেন। তারপরেই সেনা, নৌসেনা এবং এথেন্সের পৌরসভার সমবেত ব্যান্ডে বেজে উঠল অলিম্পিকের জাতীয় সংগীত। এর গীতিকার কসটিস পালামাস আর সুরকার স্পাইরস সামারাস। শুরু হয়ে গেল আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠান।

এথেন্স অলিম্পিকে মোট ন'টি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল— অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, সাতার, ভারোত্তোলন, টেনিস, শুটিং, ফেন্সিং, জিমন্যাসটিক্স এবং সাইক্লিং। ১৩টি দেশের মোট ৩১১ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী গ্রিসের দিমিত্রিয়াস লোন্ড্রাস (১০ বছর ২১৮ দিন) অংশ নিয়েছিল জিমন্যাসটিক্সে। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর জন্যই শুধু ছিল পুরস্কার। প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য ছিল রুপোর মেডেল এবং জলপাই গাছের পাতার মুকুট এবং দ্বিতীয়র জন্য ব্রোঞ্জ মেডেল। তবে ম্যারাথন দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে গ্রিসের স্পিরিডন লুইস হয়ে গেলেন প্রথম অলিম্পিকে অবিসংবাদী নায়ক।

প্রথম মহিলা স্বর্ণ পদক জয়ী চার্লট কুপার

প্যারিস (১৯০০) থেকে সিডনি (২০০০) : টুকরো কথা

১৮৯৬-এ এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিকের সূচনার পরে প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এই প্রতিযোগিতা। শুধু ১৯১৬, ১৯৪০ এবং ১৯৪৪-এ বিশ্বযুদ্ধের জন্য বসেনি অলিম্পিকের আসর। এথেন্স থেকে আবার এথেন্সে ফিরে আসার মধ্যবর্তী ১০৮ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ২০টি শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩টি অলিম্পিক। প্যারিস, লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলস-এর ভাগ্যে জুটেছে দুবার। আবার এথেন্সের আসরে প্রবেশ করার আগে একঝলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ওই ২৩টি আসরের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যে।

১৯০০ প্যারিস : চার বছর আগের এথেন্সের সেই উচ্ছাস উদ্দীপনা ছিল না প্যারিসে। বিশ্ব বাণিজ্য মেলার অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারিস অলিম্পিক এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল।

১৯০৪ সেন্ট লুইস: এই অলিম্পিকও তেমনভাবে দাগ কাটেনি। অলিম্পিকের স্থান নির্বাচন নিয়েও চলেছিল রাজনীতি। কুবার্তিন চেয়েছিলেন অনুষ্ঠান হোক শিকাগোতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়েছিল সেন্ট লুইসের ভাগ্যেই। এই অলিম্পিকও বাণিজ্য মেলার অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল প্রায় ছ-মাস ধরে।

১৯০৮ লন্ডন : পেনসিলভ্যানিয়ার বিশপ, এথেলবার্ট ট্যালবট প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে রাখলেন এক অসাধারণ বক্তব্য, 'অলিম্পিকের মূল্য উদ্দেশ্য যোগদান করা, জয় করাটা বড়ো কথা নয়। আমাদের জীবনেও জয় করাটা জরুরি নয়, ভালোভাবে লড়াই করাটাই আসল কথা।' এই অলিম্পিকেই প্রথম প্রতিটি দেশকে তাদের জাতীয় পতাকা বহন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘটেছিল একটি অপ্রীতিকর ঘটনা। ইংরেজদের বক্তব্য আমেরিকা তাদের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড এবং রানি আলেকজান্দ্রাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখায়নি। এই ঘটনার জেরে দীর্ঘদিন এই দুই দেশের মধ্যে ছিল তিক্ততা। এই অলিম্পিকের ম্যারাথনে পরাজিত হয়েও নায়ক হয়ে গেছিলেন ডোরান্ডো পিয়েত্রি- দ্য ইমর্টাল লুজার।

১৯১২ স্টকহোম : মার্চ পাস্টে দেশের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড বহন শুরু হল এই অলিম্পিকেই। এছাড়াও সূচনা হল ইলেকট্রনিক টাইমিং এবং পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণার।

১৯২০ অ্যান্টার্প : এই অলিম্পিকেই হাওয়ায় উড়তে শুরু করে অলিম্পিক পতাকা। প্রাচীন অলিম্পিয়ার অন্তর্গত ডেলফি ভ্রমণকালে কুবার্তিন একটি পাথরে খোদাই করা পাঁচটি রিং দেখতে পান। অলিম্পিক পতাকার ভাবনাটা তখনই আসে তাঁর মাথায়। অলিম্পিক পতাকার নক্সাটি তৈরি হয়েছিল ১৯১৪ সালে প্যারিসে। নীল, হলুদ, কালো, সবুজ ও লাল, এই ক্রমে পাঁচটি রিং পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে। রিংগুলির পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকার অর্থ হল খেলাধূলায় উৎকর্ষের জন্য প্রতিটি মহাদেশের একাত্মতা। ১৪ অগাস্ট বেলজিয়ামের রাজা অ্যালবার্ট ও রানি এলিজাবেথের সামনে উদ্বোধন

লন্ডন অলিম্পিকের দৃশ্য

হয় অলিম্পিক পতাকার। এই পতাকাটিই ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৮৪-র অলিম্পিক পর্যন্ত। ১৯৮৮-তে সিওলে শুরু হয় নতুন পতাকার ব্যবহার। এই অলিম্পিকেই প্রথম সব প্রতিযোগীদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ক্রীড়াবিদের শপথ নেওয়া শুরু হয়। অলিম্পিক ইতিহাসে প্রথম শপথ নেবার সৌভাগ্য হয় বেলজিয়ামের ফেনসিং খেলোয়াড় ভিক্টর বয়েন-এর। আর এই অলিম্পিকের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হলেন পাভো নুরমি।

১৯২৪ প্যারিস : প্যারিসই হল প্রথম শহর যারা দ্বিতীয়বার অলিম্পিকের আয়োজক হবার সুযোগ পায়। এই অলিম্পিকে নুরমি উপস্থিত থাকলেও নায়ক হয়ে যান জনি ওয়েসমুলার। এই বছরেই শুরু হয় প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ফ্রান্সের চেমোনিক্স-এ।

১৯২৮ অ্যামস্টারডম : রাজনৈতিক কারণে রানি উইল হেলমিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেন। শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া শুরু হয় এখানেই। এই অলিম্পিকে প্রথম মহিলারা ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অলিম্পিক মশালের প্রবর্তন— যা জ্বলবে অলিম্পিকের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন অবধি। এই ভাবনাটিও নেওয়া হয়েছে প্রাচীন গ্রিস থেকে, অলিম্পিয়ায় দেবী হেসটিয়ার মন্দিরের সামনে জ্বলত আগুন— যার থেকে পাওয়া গেছে অলিম্পিক মশালের ভাবনা।

১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলস : প্রথম অলিম্পিক ভিলেজের সূচনা হয়। অটোমেটিক টাইমিং এবং ফোটো ফিনিস ক্যামেরা চালু হয় এই অলিম্পিকেই।

১৯৩৬, বার্লিন : হিটলার চেয়েছিলেন অলিম্পিকের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কাছে দেখাবেন তাঁর পরাক্রম, কিন্তু নায়ক হয়ে গেলেন জেসি ওয়েন্স। টেলিভিশনের মাধ্যমে খেলার সম্প্রসারণ শুরু হয় এই অলিম্পিকেই । শহরের ২৫টি ভিন্ন স্থানে বিশাল পর্দায় দর্শকরা বিনামূল্যে খেলা দেখতে পেয়েছিলেন। হিটলারের ঘনিষ্ট বন্ধু লেনি রিফেনস্ট্যাইল 'অলিম্পিশে স্পিয়েলি' (Olympiche Spiele) নামে একটি চলচিত্র তৈরি করেছিলেন যেটি খেলাধূলা নিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হল জুলাই-এর ২০ তারিখে। অলিম্পিয়ায় জিউস-এর মন্দিরের সামনে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে মশাল জ্বালানো হয়। তারপর সেই মশাল ৩০,০০০ দৌড়বীর রিলে রেসের মাধ্যমে বার্লিনে নিয়ে এলে তাই দিয়ে স্টেডিয়ামের মশাল জ্বালানো হয়।

১৯৪৮ লন্ডন : প্যারিসের পরে লন্ডনের সৌভাগ্য হল দ্বিতীয়বার অলিম্পিক আয়োজন করার। এই অলিম্পিকের নায়ক হলেন এমিল জেটোপেক এবং ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন।

১৯৫২ হেলসিংকি : উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেন জনৈক জার্মান উগ্রপন্থী। এই দৃশ্যে আতঙ্কিত হলেও আরেক দৃশ্য মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের যখন ৫৫ বছর বয়সি কিংবদন্তি পাভো নুরমি মশাল হাতে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন।

১৯৫৬ মেলবোর্ন : এই অলিম্পিকের বৈশিষ্ট হল দু-দুটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মূল উদ্বোধন এবং সব প্রতিযোগিতাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেলবোর্নে। কিন্তু কঠোর কোয়ারেন্টাইন আইনের জন্য ইকোয়েস্ট্রিয়ান ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্টকহোমে। এক অভিনব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সব প্রতিযোগীরা ঘোড়ার পিঠে চেপে অংশ নেন সেই মার্চ পাস্টে।

১৯৬০ রোম : এই প্রথম অলিম্পিকের খেলা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের বাইরে সম্প্রসারিত হল। নগ্নপদ বীর আবেবে বিকিলা হলেন নায়ক। আর নিষিদ্ধ ওষুধ সেবনের প্রথম অপরাধী, ডেনমার্কের সাইক্লিস্ট ক্লুড জেনসন হয়ে গেলেন খলনায়ক।

১৯৬৪ টোকিও : পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানালো জাপান। হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিনে জন্ম হয়েছিল ইশোউরি সাকাই-এর। তাঁকেই দেওয়া হল অলিম্পিক মশাল জ্বালাবার দুর্লভ সম্মান।

১৯৬৮ মেক্সিকো : নিরাপত্তার অভিনব কড়াকড়ি লক্ষ্য করা গেল, কারণ সেইসময় ওই দেশে চলেছিল ছাত্র আন্দোলন। এই প্রথম একজন মহিলা ক্রীড়াবিদ জ্বালালেন অলিম্পিক মশাল। বাসিলিও সোটেলো হলেন এই ব্যাপারে পথিকৃত। বব বিমন লং জাম্পে করলেন বিশ্বরেকর্ড, যে রেকর্ড অক্ষত ছিল দুই দশক।

১৯৭২ মিউনিখ : কলঙ্কিত হল অলিম্পিক— প্যালেস্টাইন গেরিলাদের আক্রমণে নিহত হলেন কয়েকজন ইজরায়েলি খেলোয়াড়। এই প্রথম একজন মহিলা ক্রীড়াবিদ শপথ নিলেন, তিনি হলেন হেইদি স্কুলার। আর সাত-সাতটি সোনা জিতে সুইমিং পুল মাতিয়ে নায়ক হলেন মার্ক স্পিজ।

১৯৭৬ মন্ট্রিল : একসঙ্গে দুজন ক্রীড়াবিদ মশাল জ্বালালেন, তারা হলেন স্টিফেন প্রোফেনটাইন ও সান্দ্রা হেন্ডারসন। নিউজিল্যান্ডকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়ে আফ্রিকার দেশগুলি অলিম্পিক বয়কট করে। নিউজিল্যান্ডের অপরাধ তারা সেইসময় বর্ণ বিদ্বেষের সমর্থক দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি রাগবি দলকে তাদের দেশে সফর করার অনুমতি দিয়েছিল। জিমন্যাসটিকের রানি নাদিয়ার আবির্ভাব হয় এই অলিম্পিকেই।

১৯৮০, মস্কো : রাশিয়ার আফগানিস্থান আক্রমণের প্রতিবাদে আমেরিকা এবং তার সমর্থক দেশগুলি অলিম্পিক বয়কট করে। শিকে ছেঁড়ে ভারতের ভাগ্যে। হকির হারিয়ে যাওয়া সোনা বহুবছর পর ফিরে পায় তারা।

১৯৮৪ লস এঞ্জেলস : এবার প্রতিশোধের পালা রাশিয়ার। চার বছর আগের আমেরিকার বয়কটের জবাবে এবার রাশিয়া এবং তার সমর্থক দেশগুলি অলিম্পিক বয়কট করে।

১৯৮৮ সিওল : বহুদিন পর বয়কটের কালো ছায়া সরে যায় অলিম্পিকের আসর থেকে। কিন্তু দুরন্ত বিশ্বরেকর্ড করে পরের দিনেই ডোপ কেলেংকারিতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে খলনায়ক হয়ে গেলেন কানাডার স্প্রিন্টার বেন জনসন।

১৯৯২ বার্সিলোনা : সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু সোভিয়েতের ১২টি দেশ যুগ্ম দল হিসেবে যোগ দিল অলিম্পিকে। কোনও জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকা ছাড়াই তাদের যোগদান অলিম্পিকে এবং পদক তালিকায় শীর্ষেও থাকল তারাই।

১৯৯৬ আটলান্টা : আবার ঘটল বোমা বিস্ফোরণ অলিম্পিকের আঙিনায়। বহুবছর পর ভারতের ভাগ্যে জুটল ব্যক্তিগত বিভাগের পদক। লিয়েন্ডার পেজ পেলেন টেনিসে ব্রোঞ্জ।

২০০০ সিডনি : প্রথম অলিম্পিকে যোগ দিয়েছিল ১৩টি দেশ, আর ১০৪ বছর পরের অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ১৯৯। অলিম্পিকের ব্যপ্তির সীমা কোথায় পৌঁছেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এন্তোনিও সামারাঞ্চের মতে সিডনি অলিম্পিকই হল আজ অবধি শ্রেষ্ঠ অলিম্পিক। ভারতীয় মহিলাদের পক্ষে একটি সুখবর। কার্নাম মালেশ্বরীর হাত দিয়ে ভারতের প্রথম মহিলার পদক এল আমাদের দেশে।

অলিম্পিকে ভারত এবং চার পদকজয়ী : অলিম্পিকে ভারতের অসাধারণ কৃতিত্ব একমাত্র হকিতেই। এক সময় হকিতে একচ্ছত্র রাজত্ব চালিয়েছে ভারতীয়রা। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬, পরপর ছটি অলিম্পিক সোনা আছে ভারতের দখলে। ১৯৬০-এর অলিম্পিকে ফাইনালে পরাজিত হলেও চার বছর পরে আবার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু ১৯৬৮-এর অলিম্পিক থেকেই ভারতীয় হকির রেখাচিত্র নিম্নগামী (১৯৮০-র সোনাটির জন্য খুব বেশি কৃতিত্ব দাবি করাটা অবশ্যই হাস্যকর)। হকি ছাড়া আর বলার সুযোগ খুব একটা বেশি নেই। একটি অলিম্পিকে ফুটবলের চতুর্থ স্থান নিয়ে আজও আমরা সুখস্মৃতিতে বুঁদ হয়ে থাকি। আর মিলখা, উষা, শ্রীরামদের জন্য আমাদের তরফ থেকে থাকে শুধু সহানুভূতি। গর্ব করতে পারি আমরা শুধুমাত্র চারজনকে

মস্কো অলিম্পিকে ওপেনিং সেরেমনি

নিয়ে তারা হলেন নরম্যান প্রিচার্ড, কে ডি যাদব, লিয়েন্ডার পেজ আর কারনাম মালেশ্বরী, যারা পেয়েছিলেন ব্যক্তিগত বিভাগের অলিম্পিক পদক।

কিংবদন্তি, সেরা দশ (?) : গত ১০৪ বছরে ২৪টি অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন অসংখ্য ক্রীড়াবিদ। তাঁদের মধ্যে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন অনেকেই। আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা বেছে নিলাম তাদের মধ্যে সেরা দশজনকে।

পাভো নুরমি : ১৯২০-র অ্যান্টার্প গেমস-এ তিনটি সোনা ও একটি রুপো পেলেন। ১৯২৪-এর প্যারিস অলিম্পিকে পেলেন পাঁচটি সোনা। এখানেই শেষ নয়, ১৯২৮-এও পেলেন একটি সোনাও দুটি রুপো। দূরপাল্লার দৌড়ের অবিসংবাদী নায়ক।

জনি ওয়েসমুলার : সাঁতারের ইতিহাসে জনিই প্রথম ব্যক্তি যে এক মিনিটের কম সময়ে ১০০ মিটারের দূরত্ব পার করেন। ১৯২৪ এবং ১৯২৮ এর অলিম্পিকে সোনা জেতেন। রুপোলি পর্দায় টারজানের ভূমিকায় জনির জনপ্রিয়তা ছিল বিশ্বব্যাপী।

এমিল জেটোপেক : ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকে ১০,০০০-এর সোনা এবং ৫,০০০ মিটার-এর রুপো। এবং ১৯৫২-তে ১০,০০০, ৫,০০০ এর সঙ্গে ম্যারাথনেও সোনা পেলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে সেবারই এমিল জীবনের প্রথমবারের জন্য অংশ নিয়েছিলেন ম্যারাথনে।

আলফ্রেড ওয়েটার : একটি নয় দুটি নয়, পর পর চারটি অলিম্পিকে ডিসকাস থ্রোতে সোনা জিতেছিলেন আলফ্রেড, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪, ১৯৬৮— টানা বারো বছর অলিম্পিকে শীর্ষে থাকা সহজ কথা নয়।

ডন ফ্রেজার : জলের রানি ডন ফ্রেজার। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম একশ মিটারে এক মিনিটের বাধা অতিক্রম করেছিলেন। পরপর তিনটি অলিম্পিকে (১৯৫৬, ১৯৬০ এবং ১৯৬৪) সোনা জিতেছিলেন ডন।

আবেবে বিকিলা : বিকিলাই প্রথম দৌড়বীর যিনি পরপর দুটি অলিম্পিকে ম্যারাথনের সোনা জিতেছিলেন। প্রথম অলিম্পিকে (১৯৬০) তিনি দৌড়েছিলেন খালি পায়ে।

মার্ক স্পিৎজ : সাঁতারের সম্রাট। একটি অলিম্পিকে (মিউনিখ, ১৯৭২) সাত-সাতটি সোনা পেয়েছিলেন তিনি, এবং প্রতিটিতেই বিশ্বরেকর্ড।

নাদিয়া কোমানেচি : জিমন্যাসটিকসে প্রথম পারফেক্ট টেন অর্জন করেন ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিকে।

জেসি ওয়েন্স : ১৯৩৬-এর অলিম্পিকে হিটলার তার পরাক্রম দেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওই অলিম্পিক হয়ে গেল জেসি ওয়েন্সের। চার-চারটি সোনা (১০০মি, ২০০ মি, লং জাম্প এবং রিলে রেস) জিতে নায়ক হয়ে গেলেন জেসি। এর আগের বছরই একটি প্রতিযোগিতায় জেসি মাত্র ৭৫ মিনিটে চার চারটি বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন এবং স্পর্শ করেছিলেন আরেকটি বিশ্বরেকর্ড।

কার্ল লুইস : জেসি ওয়েন্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লুইসও ওই একটি চারটি বিষয়ে সোনা জিতলেন ১৯৮৪-এর লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে। সব মিলিয়ে মোট নটি সোনা পেয়েছিলেন লুইস।

সেরা-নির্বাচন সবসময়েই বিতর্কিত। অনেক কিংবদন্তিই বাদ পরলেন এই তালিকা থেকে যেমন ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কারস কোয়েন, উইলমা রুডলফ, ক্রিস্টিন অটো, মহম্মদ আলি, ফ্লয়েড প্যাটারসন রয় এইরি প্রমুখ।

ভাস্কর্যে রুপো পেয়েছিলেন চিন্তামণি কর :১৯১২ থেকে ১৯৪৮-এর অলিম্পিকগুলিতে পাঁচটি আর্টিস্টিক নন-স্পোর্টস ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। সেগুলি হল সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য, পেইন্টিং এবং আর্কিটেকচার। ১৯১২-তে ব্যারন পিয়ের দ্যা কুবার্তিন পেয়েছিলেন সাহিত্যের স্বর্ণপদক। ছদ্মনামে লেখা পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থটির

নাম ode to sport. আর এই আর্টিস্টিক বিভাগে একজন বাঙালি পেয়েছিলেন রৌপ্য পদক। ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকে ভাস্কর্যে দ্বিতীয় হয়েছিলেন শিল্পী-ভাস্কর চিন্তামণি কর। একটি সাক্ষাৎকারে শ্রী কর সন্দেশকে জানিয়েছেন তাঁর পদক জয়ের কাহিনি।

ঘটনাবহুল ছেলেবেলা শ্রী করের। বারো বছর বয়সে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। আর্ট স্কুলে ভর্তির দাবিতে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যে সাময়িক গৃহত্যাগও করতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৪৬ সালে তিনি লন্ডন চলে যান এবং পরে সেখানে নাগরিকত্বও লাভ করেন। ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকের আগে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ইন আর্ট (অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত) প্রতিযোগিতার ভাস্কর্য বিভাগে ২৯টি দেশ যোগ দিয়েছিল। স্কেটিং-এর বিভিন্ন ভঙ্গি ভালো লাগত চিন্তামণি করের। কানাডার একটি মেয়ে সেইসময় স্কেটিং-এ খুব বিখ্যাত হয়েছিল। সেই খেলোয়াড়ের একটি বিশেষ ভঙ্গি ধরে রেখেছিল শ্রী করের ভাস্কর্য "স্কেটিং দ্য স্ট্যাগ"; যার জন্য তিনি পেয়েছিলেন রৌপ্য পদক। মূল ভাস্কর্যটি এই মুহূর্তে রাখা আছে বুখারেস্টের জাতীয় জাদুঘরে। কানাডার ফিগার স্কেটিং-এর কর্মকর্তাদের অনুরোধ ওই মূর্তিটির একটি ছোট প্রতিরূপও তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই ছোট মূর্তিটি বর্তমানে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় কানাডার ফিগার স্কেটিং-এর বিজয়ীকে। পুরস্কার নিতে যাবার সময় ঘটেছিল একটি মজার ঘটনা। সেখানে গিয়ে চিন্তামণি কর জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর ভাস্কর্যটিই প্রথম স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর নাম লেখা দিল C. Kar এবং যেহেতু তিনি ব্রিটিশ নাগরিক তাই তাঁকে কর্মকর্তারা ইংরেজ বলেই ভেবেছিলেন। পেইন্টিং-এও একজন ইংরেজ প্রথম স্থান পেয়েছিলেন এবং ভাস্কর্যেও একজন ইংরেজকে সোনা দিলে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই ভাস্কর্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী স্কটল্যান্ডের চার্লস কারকে দেওয়া হল প্রথম স্থান এবং চিন্তামণি করের ভাগ্যে জুটল দ্বিতীয় স্থান। পরিচয়ের পর কর্মকর্তাদের আফশোষ ছিল চোখে পড়ার মতো। চিন্তামণি করের ভারতীয় পরিচয়টি জানলে তাঁর ভাগ্যেই জুটত স্বর্ণপদক।

এমিল জ্যাটোপেক

জানা অজানা কিছু আকর্ষণীয় তথ্য : উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মার্চ পাস্টে গ্রিস আসে সবার আগে এবং সবশেষে আসে আয়োজক দেশ। (আমরা অপেক্ষায় থাকব এবারের অলিম্পিকে এই ক্রমপর্যায়টা কেমন থাকে)।

এডওয়ার্ড ইগানই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সোনা জেতার (বক্সিং) পাশাপাশি শীতকালীন অলিম্পিকেও পেয়েছিলেন একটি সোনা (স্লাই ইভেন্টে)।

মস্কো অলিম্পিকে 'কক্সওয়েনলেস পেয়ার ওয়ারস'-এ সোনা জিতেছিলেন দুই যমজ ভাই বার্ড ল্যান্ডভয়েট ও জর্গ ল্যান্ডভয়েট। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে রুপোও পেয়েছিলেন একজোড়া যমজ—ইউরি প্রিমেনোভা ও নিকোলাই প্রিমেনেভো।

আধুনিক অলিম্পিকে প্রথম বিজয়ীর সম্মান পেয়েছিলেন হপ, স্টেপ এন্ড জাম্প'-এ (অধুনা ট্রিপল জাম্প) জেমস বি কনোলি।

তিন তিনজন প্রতিযোগী সম্পর্কহীন দুটি ভিন্ন ইভেন্টে সোনা জিতেছেন, তারা হলেন কার্ল স্কুম্যান (জিমন্যাসটিকস্ ও কুস্তি, ১৮৯৬) ড্যানিয়েল নরলিং (জিমন্যাসটিকস্, ১৯০৮, ১২ এবং শো জাম্পিং, ১৯২০), মরিস কিরসে (৪ x ১০০ মিটার রিলে এবং আমেরিকান রাগবি, ১৯২০)।

১৮৯৬-এর অলিম্পিকে মহিলাদের জন্য ছিল মাত্র দুটি ইভেন্ট, টেনিস এবং গল্ফ। গল্ফে প্রথম হন আমেরিকার মার্গারেট এবট, আর টেনিসে সেই সময়ের তিন তিনবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান চার্লট কুপার থাকেন প্রথম স্থানে। চার্লট পরে অল-ইংল্যান্ডের আরও

খেতাব জিতেছেন।

পাঁচটি দেশ প্রতিটি অলিম্পিকে যোগ দিয়েছে, তারা হল গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও গ্রিস।

পদক সংগ্রহে শীর্ষে আছেন রাশিয়ার মহিলা জিমন্যাস্ট লারিসা ল্যাটিনিনা। তিনি সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে পেয়েছেন ১৮টি পদক। অর পুরুষ বিভাগে শীর্ষে আছেন রাশিয়ারই এক জিমন্যাস্ট নিকোলাই আন্দ্রিয়ানোভ। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ১৫টি পদক।

সোনা কুড়োনোয় সবার আগে রয় এইরি (১০)। নুর্মি, লুইস ও স্পিজ পেয়েছেন নটি করে স্বর্ণপদক।

এক দম্পতি, কর্নেলিয়া এন্ডার ও তার স্বামী রোন্যান্ড ম্যাথেজ তিনটি অলিম্পিক মিলিয়ে পদক পেয়েছেন ১৬টি।

পরপর পাঁচটি অলিম্পিকে সোনা পেয়েছেন ড. রেইনার ক্লিমকে। দলগত ড্রেসেজ ইভেন্টে তিনি সোনা পান (১৯৬৪, ৬৮, ৭৬, ৮৪, ৮৮)। শেষ অলিম্পিকে যোগদানের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫২।

হকির দৌলতে দলগত বিভাগে অনেক ভারতীয়ই পেয়েছেন সোনা, রুপো ব্রোঞ্জ। তিনজোড়া বাবা-ছেলের সংগ্রহে রয়েছে অলিম্পিক পদক। তাঁরা হলেন ধ্যানচাঁদ (সোনা, ১৯২৮, ৩২, ৩৬) ও অশোককুমার (ব্রোঞ্জ, ১৯৭২), আহমেদ শের খান (সোনা, ১৯৩৬) ও আসলাম শের খান (ব্রোঞ্জ ১৯৭২), ড: ভেস পেজ (ব্রোঞ্জ ১৯৭২) ও লিয়েন্ডার পেজ (ব্রোঞ্জ ১৯৯৬)। লিয়েন্ডারের পদকটি অবশ্য হকিতে নয়, টেনিসে।

অলিম্পিকের মন্ত্র : অলিম্পিকের মূলমন্ত্র 'সিটিয়াস', 'অলটিয়াস', 'ফরটিয়াস'। ফাদার আঁরি মার্টিন ডিডিওন এই মন্ত্রের স্রষ্টা। এর অর্থ আরও জোরে, 'আরও উঁচুতে', 'আরও শক্তিতে'। এই মূলমন্ত্রকে আদর্শ করেই বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা সম্মিলিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। কিন্তু শুধু জয়ের উদ্দেশ্যে নয়। রাজনীতি, ডোপিং, বয়কট, উগ্রপন্থীর হানা অলিম্পিকের আদর্শকে আঘাত হানে ঠিকই কিন্তু অলিম্পিকের মশালকে নির্বাপিত করা যায় না। মানব সভ্যতা যতদিন থাকবে, অলিম্পিক থাকবে ততদিনই।

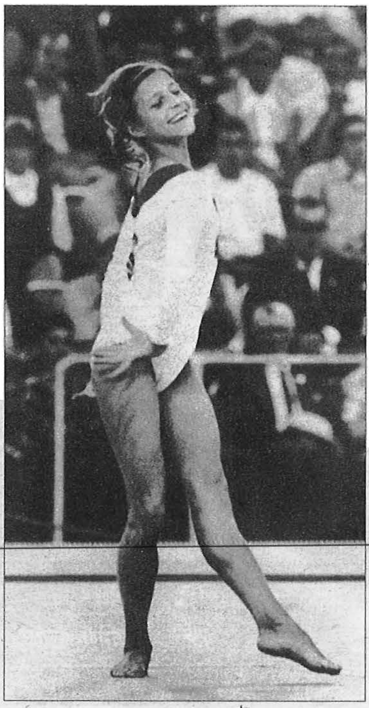

ওলগা কোরবুট

এডউইন মোজেস

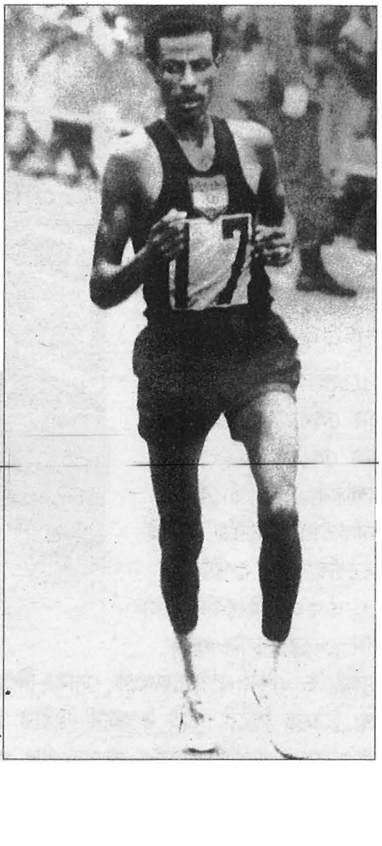

আবেবে বিকিলা

● ১৯০৪ সালে আমেরিকার সেন্টলুই অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিতে এসেছিলেন কিউবার ফেলিক্স কারবাজাল। হাভানায় ডাকপিওনের কাজ করতেন। অলিম্পিকে যোগদানের জন্য প্রদর্শনী দৌড়ে অংশ নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে জাহাজে চেপে বসলেন। জাহাজে আসার পথে জুয়া খেলার প্রলোভনে পড়ে তাঁর সর্বস্ব খোয়া গেল। অনেক কষ্টে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার দিন তিনি সেন্টলুইতে পৌঁছলেন। তখন তাঁর পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে ফুলহাতা জামা, পায়ে ভারীবুট। তাঁর অবস্থা দেখে জনৈক প্রতিযোগী কাঁচি দিয়ে জামাপ্যান্ট ছেঁটে দিলেন। ফুলপ্যান্ট কেটে হাফপ্যান্ট জামার হাতা কেটে ফতুয়ায় পরিণত করা হল। এই পরেই কারবাজাল দৌড়ে অংশ নিলেন। দর্শকেরা হেসে অস্থির। দীর্ঘ ২৬ মাইল দৌড় শুরু হল। দৌড়ে দৌড়ে ডাক বিলি করতেন কারবাজাল, সেই অভ্যাসটা কাজে লেগে গেল। সবার আগে এগিয়ে চললেন, পিছনে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ তাঁর নজরে এল রাস্তার পাশে বাগানে গাছভর্তি পাকা আপেল। লোভ সামলাতে পারলেন না তিনি, ভাবলেন একটা আপেল নিয়েই ছুটবেন। কিন্তু গাছে উঠে, নেমে আপেল পাড়তে গিয়ে যে সময় চলে গেল তাতে শুধু সোনা, রুপো নয়, ব্রোঞ্জ পদকও ফস্কে গেল। কারবাজাল দৌড় শেষ করলেন ৪র্থ হয়ে।

অলিম্পিকের মজার ঘটনা

● ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ম্যারাথনে অংশ নেন ফরাসি প্রতিযোগী মাইকেল টিয়োটো। তিনি প্যারিসে এক বেকারিতে ভ্যানচালকের কাজ করতেন। পাঁউরুটি বিলি করতে করতে শহরের অলিগলি তাঁর মুখস্থ ছিল। ফলে যখন প্রতিযোগীরা নির্দিষ্ট রাস্তায় দৌড়চ্ছেন, তখন টিয়েটো শর্টকাট করে বাজিমাৎ করলেন। মার্কিন প্রতিযোগী আর্থার নিউটন নিশ্চিত ছিলেন তিনি সবার আগে চলেছেন, হঠাৎ দেখেন তাঁর আগে আর একজন ছুটে চলেছে। তিনি অবাক। লোকটা তাঁকে না টপকে আগে গেল কী করে? তিনি ও অন্য কয়েকজন প্রতিবাদ করেও মাইকেলের চালাকি প্রমাণ করতে পারলেন না।

● তবে এই ম্যারাথন দৌড়েই এক মার্কিন প্রতিযোগী জালিয়াতি করে ধরা পড়ে যান। এর নাম প্রেড লোর্জ। তিনি ছোটার রাস্তায় কায়দা করে একটা গাড়িতে উঠে পড়েন। তারপর সবার আগে লক্ষ্যে পৌঁছে যান। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে তাঁর চালাকি ধরা পড়ে যায়। সাংবাদিকদের কাছে অবশ্য লোর্জ বলেন "স্রেফ মজা করার জন্য মাঝপথে গাড়িতে চড়েছিলাম।"

সংগ্রহ : বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকজন অলিম্পিয়ানের নিক্‌নেম্‌

হিউম্যান ডিয়ার : হার্ব এলিয়ট
(অ্যাথলিট, অস্ট্রেলিয়া)

হর্স : অ্যালবার্তো জুয়ান্তোরেনা
(অ্যাথলিট, কিউবা)

ব্রাইটন এক্সপ্রেস : স্টিভ ওভেট
(অ্যাথলিট, ইংল্যান্ড)

ব্ল্যাক গেজেল : ইল্‌মা রুডল্‌ফ্‌
(অ্যাথলিট, আমেরিকা)

ফ্লো জো : ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার
(অ্যাথলিট, আমেরিকা)

মার্ভেলাস মা মা : ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েন
(অ্যাথলিট, ইংল্যান্ড)

বোন্‌স্‌ : হ্যারিসন ডিলার্ড
(অ্যাথলিট, আমেরিকা)

হিউম্যান লোকোমোটিভ : এমিল জ্যাটোপেক্‌
(অ্যাথলিট, চেকোশ্লভাকিয়া)

দ্যা সিফটার : মিরুসে ইকটার
(অ্যাথলিট, ইথিওপিয়া)

ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন আর্ম : অ্যাল ওয়েটার
(অ্যাথলিট, পর পর চারটি অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী, আমেরিকা)

দ্য ফ্লাইং ফিন : পাভো নুরমি
(অ্যাথলিট, ফিনল্যান্ড)

অ্যালবাট্রাস : মাইকেল গ্রস
(সাঁতারু, জার্মানি)

টরডেডো : ইয়ান হর্প
(সাঁতারু, অস্ট্রেলিয়া)

দ্য লিট্‌ল মিস্‌ পারফেক্ট : নাদিয়া কোমানেচি
(জিম্‌ন্যাস্ট, রুমানিয়া)

লটি : শার্লট ডড্‌
(তিরন্দাজ অ্যাথলিট, ইংল্যান্ড)

হকি ফকির : ধ্যানচাঁদ
(হকি খেলোয়াড়, ভারত)

সংগ্রহ : অজাতশ্মশ্রু

আজকাল প্রকাশন-এর

খেলা

এখন পাক্ষিক অন্যরকম চেহারায়

দেশ-বিদেশের খেলাধুলোর খবর
তারকাদের রঙিন ব্লো-আপ।
আকর্ষণীয় ফিচার।
বিষয়-বৈচিত্র্যে অসাধারণ।

---

৮ টাকায় ৪৮ পাতা

প্রথম অলিম্পিক ডাকটিকিট

গৌতম কুমার দে

অলিম্পিক নিয়ে বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশ স্মারক ডাকটিকিট ইস্যু করেছে। তবে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় গ্রিস।

৬—১৫ এপ্রিল ১৮৯৬। প্রায় দেড় হাজার বছর পর গ্রিসের এথেন্সে বসল আধুনিক অলিম্পিকের আসর। এই উপলক্ষ্যে গ্রিসের ডাকবিভাগ ১২টি স্ট্যাম্পের যে সেট প্রকাশ করে তার প্রথমটি বক্সিং নিয়ে। বক্সিংয়ের শুরু কবে জানা যায়নি। মিনোয়ান ও ম্যাসিনিয়ান যুগে এর চল ছিল। গ্রিসীয় বিশ্বাস— এটা দেবতাদের খেলা। অলিম্পিয়ার প্রথম বক্সিংয়ে অ্যাপেলো হারিয়ে দেন যুদ্ধের দেবতা অ্যারেসকে।

লাইসিপ্পাস (Lysipus) কৃত পলিদামুসের (Polydamus) স্ট্যাচুর বেদির অংশবিশেষ স্ট্যাম্পে ছাপা হয়। হলদে রঙের ডাকটিকিটটির দাম ১ লেপটা (lepta)। পলিদামুস ৯৩ তম অলিম্পিয়াডে প্যানক্রশন (বক্সিংয়ের চেয়েও নৃশংস খেলা)-এ জয়ী হন। ডাকটিকিটের মূল নকশা হোমারের সেই লাইন কটি মনে করিয়ে দেয়—

“And both began the combat
Lifting their strong arms, they brought
Their heavy hands together
Fearfully was heard the crash of jaws ...”

প্রসঙ্গত খেলা নিয়ে এটাই বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট।

রোনাল্ড হিলের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে উরুগুয়ের স্ট্যাম্পে হিল সাহবের সঙ্গে প্রথম অলিম্পিক স্ট্যাম্পটিও উদ্ধৃত হয়। (উপরে) স্প্যানিশ ভাষায় লেখা :

প্রিমেরা এসটাম্পিয়া কন তেমা অলিম্পিকা
পারা লা রেয়ানুদাসিওন দে লাস অলিম্পিয়াদাস
গ্রেসিয়া ১৮৯৬।

অর্থ : অলিম্পিক গেমসের পুনর্জন্ম উপলক্ষে
অলিম্পিক বিষয়ক প্রথম ডাকটিকিট
গ্রিস ১৮৯৬।

প্রসঙ্গত ডাকটিকিটের ব্যবহার চালু হল ১৮৪০ সালে ৬ মে, লন্ডনে। পুরো পরিকল্পনাটি ছিল স্কুল মাস্টার রোনাল্ড হিলের (১৭৯৫-১৮৭৯) মস্তিষ্কপ্রসূত। অলিম্পিকের ৭৫ বর্ষপূর্তিতে গ্রিসে যে বিশেষ খাম ইস্যু করে (১০-০৪-১৯৭১) তাতে ১৮৯৬ সালে সে দেশে প্রকাশিত ৮টি স্ট্যাম্পের ছবি ছাপা হয়।

‘প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গেমস’ সিরিজে (১৮৯৬) গ্রিস পূর্বোক্ত বক্সিং স্ট্যাম্পটি সঙ্গে আরও ১১টি স্মারক ডাকটিকিট ইস্যু করে। সবকটিই পারফড়। এর মধ্যে ৫ লেপটা দামের লালচে-বেগুনি ডাকটিকিটে আছে ডিসকাস থ্রোয়ারের ছবি। প্রাচীন গ্রিসে গান ও বাজনার তালে তালে যেভাবে ডিসকাস ছোঁড়া হোত,

বর্তমান থ্রোয়ারের দেহভঙ্গিমা তারই অনুকরণ মাত্র। গ্রিসের লোকগল্প এবং হোমারের 'ইলিয়ড'-এ ডিসকাস ছোঁড়া খেলার উল্লেখ আছে।

লাল (২৫ লেপটা) ও কালো (৬০ লেপটা) বর্ণের স্ট্যাম্পদ্বয়ের জন্য বাছা হয় চার ঘোড়ায় ('খেলাটির নাম টেথরিপ্পোন') টানা দু'চাকার রথদৌড় খেলাটিকে। পঞ্চম শতকের রৌপ্যমুদ্রা থেকে মোটিফটি নেওয়া হয়। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই খেলায় ঘোড়ার মালিকরা সরাসরি অংশগ্রহণ করত না। তাদের ভাড়া করা লোক এই রথ চালাতো। তবে জিতলে কৃতিত্ব ও পুরস্কার দুই-ই পেত মালিক। রথ চালকের জন্য বরাদ্দ বলতে একটা রঙিন ছোট ফিতে মাত্র। গ্রিক ডাকটিকিট-শিল্পীরা পরবর্তীকালে অন্তত তিনবার এই মোটিফটি ডাকটিকিটে ব্যবহার করেন।

২০ (বাদামি) ও ৪০ (বেগুনি) লেপটা মূল্যের ডাকটিকিট দুটির ছবি একইরকম : কুঁজো আকৃতির পাত্রের গায়ে জ্ঞান ও বিদ্যার গ্রিক দেবী 'প্যালাস্ অ্যাথিনি'। ১ ড্রাক্‌মা (১০০ লেপটা = ১ ড্রাক্‌মা) দামের ব্লু রঙের স্ট্যাম্পটির বিষয় গ্রিসের নগরদুর্গ অ্যাক্রোপোলিস এবং স্টেডিয়াম।
খ্রিঃ পূঃ ৫ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাথেনার জন্য এটি নির্মিত হয় প্রাচীর ঘেরা দুরারোহ পর্বতের ওপর। স্টেডিয়ামটি অনেক পরের। প্রসঙ্গত অলিম্পিক গেমসের শুরুতে কোনও স্টেডিয়াম ছিল না। স্টেডিয়াম প্রথম তৈরি হল ৩৫০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ। অলটিসে।

একই সিরিজে লালচে (২ লেপটা) ও ধূসর (১০ লেপটা) রঙের দুটি স্ট্যাম্পও ইস্যু করা হয়।

অলটিসে 'টেম্পল অফ হেরা'-র ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয় (৮মে, ১৮৭৭) প্রাক্সিটেলেস (Praxiteles) -এর করা 'হেরমেস ও ডিওনিসুস' মূর্তিটি, এই অনুপম ভাস্কর্যের পূর্ণাবয়ব রূপ জলপাই রঙের (২ ড্রাক্‌সা) স্ট্যাম্পে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে হেরমেসের মূর্তিটির অংশবিশেষের ক্লোজ আপ (হাঙ্গেরি ও হল্যান্ডের ডাকটিকিটে) এবং শুধুমাত্র তার মাথা (রিপাবলিক অফ লিগার) স্ট্যাম্পে মুদ্রিত হলেও সম্পূর্ণ মূর্তিটি কেবল ১৮৯৬-র স্ট্যাম্পে দেখানো হয়েছে। ডাকটিকিটে, সুদর্শন তরুণ-হেরমেস গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে এক থোকা আঙুর। সেটাকে ধরতে উদ্যত জিউস পুত্র ডিওনিসুস। হেরমেসের পা ও মাথার অবস্থান, দেহভঙ্গি, সর্বোপরি দাঁড়ানোর অভিজাত ও স্বাভাবিক ধরনটি মূর্তিটিকে এক মাত্রা দিয়েছে।

৫ ড্রাক্‌মা মূল্যের (সবুজ) লম্বাকৃতি স্ট্যাম্পের জন্য নির্বাচিত হয় গ্রিক ভাস্কর পায়েওনিয়াসের তৈরি বিজয়ের দেবী নাইকের মূর্তি। জিউসের মন্দিরের বর্হিভাগে ৯ মিটার উঁচু ত্রিকোণাকৃতি থামের ওপর এই মার্বেল পাথরের মূর্তিটি ছিল। 'নাইক'-এর মূর্তি বাছার কারণ এর প্রতি অ্যাথলিটদের অগাধ ভক্তি। তাছাড়া প্রাচীন গ্রিসে খেলাধুলায় বিজয়ের দেবীরূপে পূজিত হতেন নাইক। নক্‌শাকার গিলিয়েরন স্ট্যাম্পে অন্ধের মতো মূল স্ট্যাচুটিকে কপি করেননি। ডাকটিকিটের ফ্রেমে অলংকরণের কাজে কোরিন্থিয়ান স্তম্ভের ওপর দু'জোড়া জলপাই গাছের শাখা ব্যবহার করেছেন। জলপাইশাখা গ্রিসে জয়ের প্রতীক ছিল। মূল ভাস্কর্যটিকে প্রথমবার পুনর্নির্মাণের সময় Griittner দেবীর হাতে বিজয়ের প্রতীকস্বরূপ লম্বা সরু ফিতে ধরিয়ে দেন। বিষয়টি সতর্ক গিলিয়েরনের নজর এড়ায়নি। স্ট্যাম্পের মূল নক্‌শায় তিনি এটিকে গ্রহণ করেছেন। সর্বোচ্চ মূল্যের (১০ ড্রাকমা বাদামি) ডাকটিকিটে দেখবে অ্যাথেনার প্রধান মন্দির প্রার্থেনননুক। এটির নির্মাণকাল ৪৪৭-৪৩৮ খ্রিঃ পূঃ। ভাস্কর ফিডিয়াসের (Phidias) ত্বাবধানে দুই স্থপতি লিক্রাটেস (Callicrates) ও ইক্‌টিনুস (Ictinus) মন্দিরটি গড়ে তোলেন।

চিরায়ত সেটটির (১২টি ডাকটিকিট) বর্তমান বাজার দর প্রায় ৩০,০০০ টাকা (স্ট্যাম্পের কন্ডিশনের উপর নির্ভয়শীল)। অধ্যাপক গিলিয়েরনও প্রথম অলিম্পিক ডাকটিকিটের নক্‌শাকার হবার সূত্রে অমর হয়ে থাকবেন। অলিম্পিক নিয়ে শত শত বিশেষ ডাকটিকিট বেরিয়েছে, বেরোবেও। কিন্তু মর্যাদায় ও গুরুত্বে প্রথমটি সকলের থেকে বরাবর আলাদাই থাকবে। বস্তুত প্রথম চাঁদে পা-দেওয়া কিংবা এভারেস্ট-জয়ের মতো প্রথম অলিম্পিক ডাকটিকিট ইস্যুর ব্যাপারটিও চিরকালের জন্য এক ও অদ্বিতীয়।

কিড্‌স গোয়ের্নিকা

কিড্‌স গোয়ের্নিকা

অসিত পোদ্দার

পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা'র (Guernica) কথা আমাদের বোধহয় সকলেরই জানা। ১৯৩৬ সালে স্পেনে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ ভয়াবহ যুদ্ধের বলি হন। এই বীভৎসতার প্রতিবাদে ১৯৩৭ সালে পিকাসো আঁকলেন তাঁর এই বিখ্যাত ছবি। আর এই আঁকার পর বদলে যায় পিকাসোর ছবি আঁকার ধরনও।

কিন্তু গোয়েনির্কা আঁকার পরেও হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ আর অতি সম্প্রতি আফগানিস্তান বা ইরাক যুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী অশান্তির আবহাওয়ার মধ্যে শান্তির উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালে জাপানের কিয়োত্তো শহরের 'আর্ট-জাপান নেটওয়ার্ক' সংস্থা ঠিক করল শিশুদের দিয়ে ছবি আঁকাবে। পিকাসোর গোয়ের্নিকাকে সামনে রেখে ঠিক হল এ ছবিরও সাইজ হবে ৩৪৯.৩ ´ ৭৭৬.৬ সেমি., আর তার নাম হবে **কিড্‌স গোয়ের্নিকা** । এতে অংশ নেবে সারা বিশ্বের শিশু।

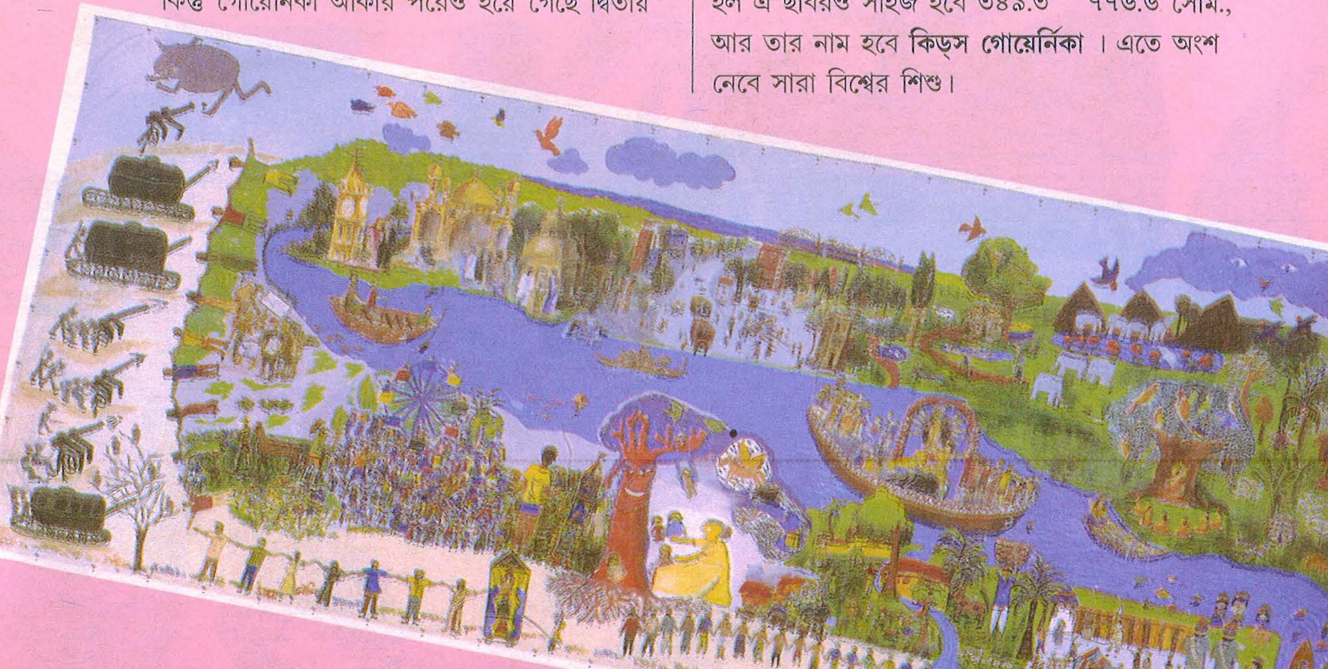

১৯৯৬ সালে বাংলার ছেলে-মেয়েদের আঁকা এই ছবিটা এবারের কিড্‌স গোয়েনিকায় নির্বাচিত হয়েছে এবং গ্রিস অলিম্পিকে যাচ্ছে।

এই উদ্যোগ প্রথম বাস্তবায়িত হল ১৯৯৫ সালে আমেরিকার ফ্লোরিডায়। তারপরেই জাপানে। পরের বছরে এল ভারতবর্ষে - খোদ কলকাতায়। এইভাবে কিড্‌স গোয়ের্নিকা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবী। এখনও পর্যন্ত প্রায় একশোটা দেশে আঁকা হয়ে গেছে এই ছবি। বেশির ভাগ ছবিই ওই বিশাল মাপের ক্যানভাসে আঁকা হলেও ব্যতিক্রমও ঘটে। কখনও কোনও দেশের বাচ্চারা কাঠখোদাইতে এঁকেছে এই ছবি। কখনও বা বাটিকে।

জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স থেকে আরম্ভ করে পাপুয়া নিউগিনি পর্যন্ত ছড়িয়েছে এই আন্দোলন। প্রতি দুবছর অন্তর কোনও একটি দেশে সারা পৃথিবীর শিশুদের আঁকা গোয়ের্নিকার প্রদর্শনী হয়। আর তাতে বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়ে আলোচনা করে পরস্পর মতবিনিময় করে। এই কিড্‌স গোয়ের্নিকাকে অনেকেই বলে থাকে আর্টের মিনি অলিম্পিক। আর সত্যি সত্যিই এবার গ্রিস অলিম্পিকে 'কিড্‌স গোয়ের্নিকা' ছবি নিয়ে হতে চলেছে এক বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন। এতে থাকছে ১৯৯৫ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে আঁকা ছবির মধ্যে থেকে নির্বাচিত সব ছবি। আর আনন্দের কথা এই যে তাতে স্থান পেয়েছে আমাদের কলকাতার শিশুদের আঁকা দুটি ছবিও। যার একটি সেই ৯৬ সালের, অন্যটি গত বছরের।

গ্রিসের পর ২০০৮ এর চিন-অলিম্পিকে এই প্রদর্শনী হবে আরও বিরাট করে ভাবা হচ্ছে। চিনের-প্রাচীর জুড়ে হবে এর প্রদর্শনী।

ফোটো : লেখক

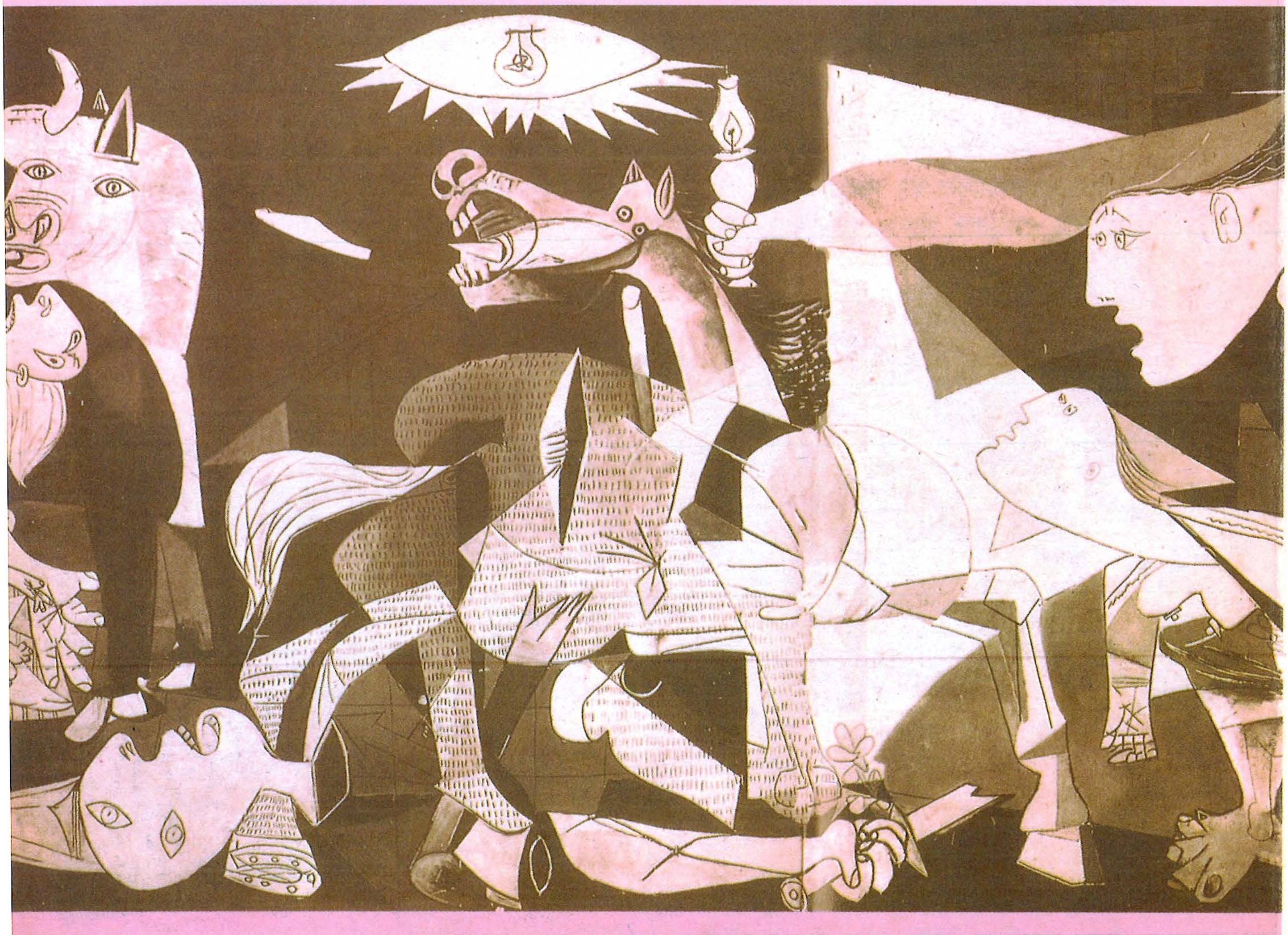

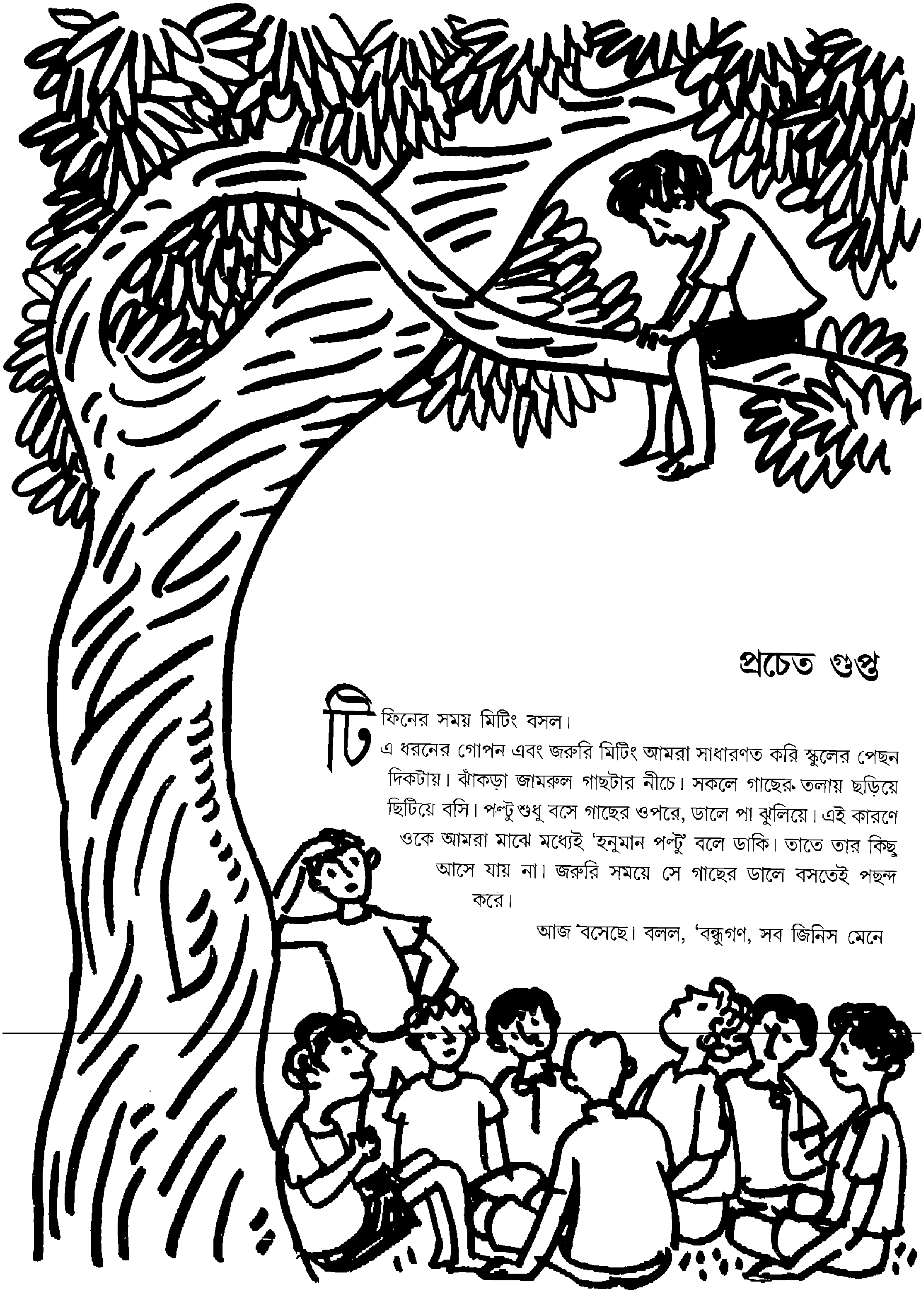

প্রচেত গুপ্ত

টিফিনের সময় মিটিং বসল।

এ ধরনের গোপন এবং জরুরি মিটিং আমরা সাধারণত করি স্কুলের পেছন দিকটায়। ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার নীচে। সকলে গাছের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসি। পল্টু শুধু বসে গাছের ওপরে, ডালে পা ঝুলিয়ে। এই কারণে ওকে আমরা মাঝে মধ্যেই 'হনুমান পল্টু' বলে ডাকি। তাতে তার কিছু আসে যায় না। জরুরি সময়ে সে গাছের ডালে বসতেই পছন্দ করে।

আজ বসেছে। বলল, 'বন্ধুগণ, সব জিনিস মেনে

নেওয়া যায়, কিন্তু এই জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। অনেক হয়েছে আর নয়।'

তপন গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে। দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছে। সবসময়ই সে এরকম করে। মনে হয়, সুযোগ পেলে লুকিয়ে ঘাস খায়ও। বলল, 'আমি পল্টুর কথা সমর্থন করি। শুধু সমর্থন করি না। একশো ভাগ সমর্থন করি। হার-জিতের থেকে অনেক বড়ো হল সম্মান। আমাদের সম্মান। ক্লাস সেভেনের সম্মান। সেই সম্মান রক্ষা করতে না পারলে ট্রফি, মেডেল জিতে লাভ কী?'

ফুচাইয়ের নামের মধ্যে একটা ফাজিল ফাজিল ব্যাপার আছে। কিন্তু সে যথেষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। আজ আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। বলল, 'প্রসূন, তোমাকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছিল সেটার কী হল?'

প্রসূন মন দিয়ে কেক খাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আমার রিপোর্ট রেডি।'

তমাল ওর হাত থেকে কেকের বাকি অংশটা কেড়ে টক্ করে নিজের মুখে পুরে ফেলল। তারপর বলল, 'আগে রিপোর্ট বল। তারপর খাবি।'

প্রসূন বেজার মুখে বলল, 'রিপোর্ট খুবই ভয়ঙ্কর এবং দুঃখজনক। শেষ এগারোটা ম্যাচে একই কাণ্ড হয়েছে। হেরে যাওয়ার পর বিশু হেসেছে। দুটো ম্যাচের ঘটনা তো মারাত্মক। সে যতবার গোল খেয়েছে, ততবার মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিক ফিক করে হেসেছে। আশ্চর্যের কথা হল,ওই দুটো ম্যাচে আমাদের ফল বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ হয়েছিল। এত খারাপ যে, খেলা শেষে আমাদের টিমের দু-একজনের চোখে জল পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। নাম বলে আমি আর তাদের লজ্জায় ফেলতে চাইছি না। তাছাড়া এই রিপোর্ট কান্না নিয়ে নয়, হাসি নিয়ে। যাই হোক, হারবার পর বিশুর হাসবার রহস্য আমি বুঝতে পারছি না।'

মল্লিব্রত লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি তোদের বলেছিলাম না? এবার বিশ্বাস হল তো?'

অজয় চোখ সরু করে বলল, 'আচ্ছা প্রসূন, তোর কী মনে হয়? এসব সময় বিশু কি চাইছিল, আমরা হেরে যাই?'

প্রসূন জিভ কেটে বলল, 'ছি, ছি এ কী কথা বলছিস্? একথা আমাদের মনে আনাও অন্যায়। বিশু না খেললে আমাদের হাঁড়ির হাল হত। তাছাড়া ও তো শুধু দল হারলে হাসে না, নিজে গোল খেলে, আউট হয়ে গেলেও হাসে। স্পোটর্সের সময় যখন দু-একটা ইভেন্টে জিততে পারেনি তখনও খুব হাসাহাসি করেছে বলে খবর পেয়েছি। সুশান্ত বলছিল, হানড্রেড মিটার আর হার্ডল রেসে পিছিয়ে পড়ে ও নাকি সব থেকে মজা পেয়েছিল।'

সুশান্ত চিন্তিত গলায় বলল, 'এটাই তো মুশকিল হয়েছে। হাসির মানে বোঝা যাচ্ছে না।'

সুকল্যাণ চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিল। শেষ দুটো ম্যাচে ক্লাস সেভেনের ভয়ঙ্কর পরাজয়ের পেছনে সুকল্যাণের আবদান খুবই বড়ো। সে দুটো সেমসাইড করেছে। একটা আবার হাতে লেগে। সুকল্যাণ উদাসীন গলায় বলল 'তোরা কিন্তু একটু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিস। দুম্ করে কিছু করে বসিস না।'

অরূপ দুঃখী মুখ করে বলল,'কোন ভাবনা চিন্তার আর সুযোগ নেই। আমরা যা ঠিক যা ঠিক করেছি সেটাই আমাদের করতে হবে। কাজটা খুবই দুঃখের। আমাদের অসুবিধেও হবে খুব। কিন্তু উপায় নেই।'

তাপস ক্লাসের ফার্স্ট বয়। যে কোনও বিষয়ে মত দেওয়াটা তার স্বভাব। তার বেশিরভাগ মতই অবশ্য শোনা হয় না। সে বলল, 'বিশুকে ডেকে একবার জিগ্যেস করলে হত না? ওরও তো একটা বক্তব্য থাকতে পারে।'

অরূপ বলল, 'থাকতে পারে। কিন্তু যে এরকম উদ্ভট আচরণ করছে তার মতামত জেনে কী হবে? তাছাড়া বিশুর জ্বর হয়েছে। আজ আসেনি। এটাই সুযোগ। বেচারি এখানে থাকলে আমরা এই কষ্টদায়ক সিদ্ধান্তটা কিছুতেই ওর সামনে নিতে পারতাম না। সুতরাং আর দেরি করাটা ঠিক হবে না।'

গাছের ওপর থেকে পল্টু বলল, 'অরূপ ঠিকই বলেছে। খুবই দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হচ্ছে। কারোর আপত্তি থাকলে হাত তোল।'

সকলে মাথা নামিয়ে বসে রইল। কেউ হাত তুলল না। এর মানে হচ্ছে, সিদ্ধান্তে সকলেই একমত।

খেলায় হারবার পরও হাসবার অপরাধে ক্লাস সেভেনের বিশ্বনাথ পাল ওরফে বিশুকে যাবতীয় টিম থেকে বাদ দেওয়া হল।

বিশুর মধ্যে একটা পাগল পাগল ব্যাপার আছে। চেহারায় কোন ছিরিছাঁদ নেই। চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। হাঁটাচলাটা ল্যাগব্যাগে ধরনের। প্যান্টে ঠিকমত গুঁজতে জানে না। জুতোর ফিতে সবসময়ই খোলা। পাগলাটে ধরনের মানুষের মজা হল, সাধারণ ক্ষমতা না থাকলেও তাদের কিছু না কিছু অ-সাধারণ ক্ষমতা থাকে। বিশুরও সেরকম

রয়েছে। তার অসাধারণ ক্ষমতা খেলাধুলোতে। সবধরনের খেলাতেই এই ছেলে দারুণ ওস্তাদ। ক্রিকেটে ওর ফিল্ডিং দেখলে চমকে উঠতে হয়। ঝপাং ঝপাং করে শুয়ে পড়ে এমন সব ক্যাচ ধরে যে নিজের দলের বোলার পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। এত ঘাবড়ে যায় যে আউট করার আনন্দে লাফাতে পর্যন্ত ভুলে যায়!

ফুটবলের সময় বিশু গোলকিপার। গোলপোস্টের দিকে আসা বল যখন সে ধরে তখন মনে হয় সে বুঝি কোনও মানুষ নয়! একটা পাখি! তার হাত দুটো আসলে দুটো ডানা। গোলপোস্টের দিকে আসা বল পাখির মতো উড়ে উড়ে সে ধরতে পারে।

একবার আমাদের গেম টিচার বিজয়বাবুর মাথায় ভূত চাপল। তিনি বললেন, ফুটবল, ক্রিকেট একঘেয়ে হয়ে গেছে। এবার অন্যকিছু করতে হবে। তিনি হকি খেলার ব্যবস্থা করলেন। আমরা সবাই ভেবেছিলাম এ খেলায় বিশু তেমন কেরামতি দেখাতে পারবে না। পারবেই বা কী করে? হকি তো আর সে কখনও খেলেনি। ওরে বাবা! দশমিনিট পরে দেখা গেল সেখানেও বিশু মারাত্মক! হকি স্টিকে যেন আঠা লাগিয়ে মাঠে নেমেছে। বল তাকে ছেড়ে অন্যদিকে যেতেই চায় না যে!

এখানেই বিশুর খেলা-প্রতিভার শেষ নয়। ক্রিকেট, ফুটবল, হকির মতো বড়ো বড়ো খেলার পাশাপাশি কবাডি , পিট্টু, বল চোরের মতো, ছোটখাটো খেলাতেও বিশুর পারদর্শিতা দেখবার মতো। স্পোর্টর্সের সময় দৌড়, লং জাম্প, হাই-জাম্পে তার ধারে কাছে কারোর আসা শক্ত। অত প্রাইজ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বেচারিকে রিক্সা ডাকাতে হয়।

বিশু অবশ্য লেখাপড়াতে ভয়ঙ্কর। যে কোনও পরীক্ষায় দুটো তিনটে বিষয়ে ফেল করা তার কাছে কোন ঘটনা নয়। তবে তাকে কখনও ক্লাসে রেখে দেওয়া হয় না। কারণ, তাহলে আমাদের ক্লাস টিমের কেলেঙ্কারি হত। বিশুর মতো তুখোড় খেলোয়াড় আমাদের ক্লাসে থাকলে কী হবে, দল হিসেবে ক্লাস সেভেন খুবই দুর্বল। এতই দুর্বল যে প্রায় সব খেলাতেই আমরা হেরে যাই। বিশু চেষ্টা করে খুব। যেখানে বারো গোলের হার অবশ্যম্ভাবী সেখানে বিশুর জন্য আমরা সাত গোলে হেরে ফিরি। যেখানে পঞ্চাশ রানে আমাদের হার কেউ আটকাতে পারবে না, সেখানে কুড়ি রানে বিপক্ষ দল জিতে যায়। বিশু এর থেকে বেশি আর কী করতে পারে? ম্যাচ শেষ হলে অন্য ক্লাসের ছেলেরা ঠাট্টা করে বলে, 'এবার থেকে অতজনে মাঠে না নেমে তোরা বরং বিশুকে একা মাঠে নামা। দেখবি রেজাল্ট ভালো হবে।'

এই তো গত বছর আন্তক্লাস ফুটবল টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে বাহান্নটা গোল খেয়ে ক্লাস সেভেন রেকর্ড করল। তবে সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফিটা কিন্তু পেয়েছিল বিশুই। সে ট্রফি পেলে আটচল্লিশটা গোল বাঁচানোর জন্য। বিশু না থাকলে আমরা বাহান্নর বদলে ঠিক একশোটা গোল খেতাম।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় মাস্টারমশাইরা এই জিনিসটা মাথায় রাখেন। বিশুকে ক্লাসে উঠতে না দিলে আমাদের অবস্থা যে ভয়াবহ হবে সেটা ওঁরা বুঝতে পারেন। হেডস্যারের সঙ্গে অনেক আলোচনা-টালোচনা করে শেষপর্যন্ত স্পোর্টর্স গ্রাউণ্ডে ওকে ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়।

তবে গত ফুটবল টুর্নামেন্টের পর থেকে গেম টিচার বিজয়বাবু খুব রেগে আছেন। বলছেন, 'এতদিন জানতাম, চাঁদের মধ্যে কলঙ্ক থাকে। কিন্তু তোদের ক্লাসে দেখছি, একগাদা কলঙ্কের মধ্যে একটা চাঁদ পড়ে রয়েছে। এ আর মেনে নেওয়া হবে না। বিশুকে হয় ফেল করিয়ে আটকে দেব, নয়তো ডবল প্রমোশন দিয়ে উঁচু ক্লাসে তুলে নেব। না তোদের সঙ্গে আর ওকে রাখা যাবে না।'

বিজয়বাবুর এই হুমকি শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। হারবারও একটা প্রেস্টিজ থাকে, বিশু না থাকলে যে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে। সেই প্রেস্টিজটুকও থাকবে না। এখনই তো আমাদের ক্লাসের নাম হয়ে গেছে, হেরো ক্লাস সেভেন, এরপরে হয়তো হবে সুপার হেরো ক্লাস সেভেন। সে বড়ো লজ্জার হবে।

এতকিছুর পরও আমাদের কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হল। ক্লাস টিম থেকে বিশুকে বাদ দিতে হল।

খবরের নিয়ম হল যে খবর যত বেশি গোপন রাখার চেষ্টা হবে সে খবর তত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। এটার ক্ষেত্রেও তাই হল। টিফিন আমরা যে সিদ্ধান্ত নিলাম, ছুটির আগে সবাই সেটা জেনে গেল। অন্য ক্লাসের ছেলেরা আমাদের এসে ধরে ধরে জানতে চাইল, এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা কোন্ সাহসে ঘটালাম?
আমরা চুপ করে থাকলাম। বেশি চাপাচাপি করলে বললাম, 'এটা ক্লাস সেভেনের নিজস্ব ব্যাপার। বলা যাবে না।'

আমাদের মন খুব খারাপ। খেলায় ক্লাস সেভেনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও খুব দুশ্চিন্তা হতে লাগল।

পরদিন স্কুলে যেতেই পল্টু, প্রসূন, সুকল্যাণকে বিজয়স্যার ডেকে পাঠালেন। চোখে মুখে টেনশন্। টিচারস্ রুমের এক কোণে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'যা শুনছি সেটা সত্যি নাকি?'

সুকল্যাণ মাথা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার সত্যি।'

স্যার আঁতকে উঠে বললেন, 'বলিস কী! সত্যি! ক্লাসশুদ্ধ তোদের সকলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কী?'

প্রসূন বলল, 'কিছু করার নেই স্যার। আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।'

স্যার চাপা ধমকের গলায় বললেন, 'ক্ষমা করব মানে? বিশু না খেললে কী অবস্থাটা হবে একবার বুঝতে পেরেছিস্? হেডমাস্টারমশাইকে আমি কী কৈফিয়ত দেব? না কিছুতেই তোমাদের একথা শোনা যাবে না। বিশুকে তোমরা আজই দলে ফিরিয়ে নাও। পরশু ক্লাস এইটের সঙ্গে তোমাদের ম্যাচ। আমি দেখতে চাই তখন বিশুও খেলছে।'

পল্টুমাথা নামিয়ে বলল, 'সেটা হয় না স্যার। বিশু খেললে আমরা কেউ খেলব না।'

স্যার রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'খেলবে না মানে। তোমাদের তো খুব সাহস বেড়েছে দেখছি।' কিছুক্ষণের মধ্যে গলা নামিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে তোদের? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বিশুর সঙ্গে সকলের ঝগড়া হয়েছে নাকি? খুলে বল তো।'

স্যারকে সব বলা হল। কীভাবে বিশু খেলায় হেরে যাওয়ার পরও হাসে, কীভাবে ক্লাস হারলে হাসতে হাসতে বাড়ি যায়, কীভাবে নিজে গোল খেয়ে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, কীভাবে আউট হয়ে যাওয়ার পর দাঁত বের করে মাঠের বাইরে ফিরে আসে, কীভাবে দৌড়ে পিছিয়ে পড়লে মজা পায় — সবই।

সব শুনে বিজয়স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মনে মনে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন। ছাদের দিকে পিটপিট করে তাকালেন। তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না, বিষয়টা সত্যি খুব জটিল। জিতলে হাসে আমি জানি, কিন্তু হারলে কেন হাসবে? হারার মধ্যে হাসির কোন বীজ লুকিয়ে আছে? হারলে তো কাঁদার কথা? এতদিন ধরে গেম টিচারের কাজ করছি। কত খেলা করলাম, কত খেলা দেখলাম। এরকম তো শুনিনি কখনও! বিশু ছেলেটার মাথায় একটু গোলমাল আছে সেটা আমরা সব মাস্টারমশাই জানি। কিন্তু এখন দেখছি গোলমাল একটু নয়, গোলমাল খুব বেশি।'

সুকল্যাণ বলল, 'তাহলেই বলুন স্যার,এরপর ওকে দল থেকে বাদ দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল? কাজটা করে আমাদের খুবই দুঃখ হয়েছে। আমরা ওকে প্রত্যেকে খুব ভালবাসি। খোলাধুলোয় ও আমাদের ক্লাসের গর্ব, স্কুলের গর্ব। কিন্তু এই ঘটনার পর ওকে বাদ না দিয়ে আমাদের কী উপায় ছিল?'

প্রসূন বলল, 'ক্লাস সেভেন সব খেলায় হারতে পারে স্যার, কিন্তু প্রেস্টিজ বলে তো একটা জিনিস থাকবে। সেটায় তো হার মেনে নেওয়া যায় না।'

বিজয়স্যার বললেন, 'কখনই নয়। তোদের মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বিশু হার জিতের ব্যাপারটাতেই একটা গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে। এই পাগলামি যদি সংক্রামিত হয় তাহলে কেলেঙ্কারি। এবার থেকে হেরে গিয়েও সবাই ধেই ধেই করে নাচবে। নিজে গেম টিচার হয়ে আমি এই বেনিয়ম কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। না, নো নেভার।' এতদূর বলে বিজয়স্যার হাঁপ নিলেন। নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু পরশুদিনের খেলাটার কী হবে? হেডমাস্টারমশাই তো কালই আমায় ডেকে বললেন, ক্লাস সেভেনের দিকে একটু নজর দিন। ওরা যে খুবই পিছিয়ে পড়ছে। এখন বিরাট চিন্তার বিষয় হল। এরকম সময় যদি তোরা দু-তিন ডজন গোলে হারিস আমি তো মুখ দেখাতে পারব না। আচ্ছা, এবারটা কী বিশুকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না? বিশুকে নিলেও তোরা যে হারবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচ্ছিরি ভাবে হারাটা তো ঠেকানো যেত আর এবারকার মত আমার মুখ কিছুটা রক্ষা পেত।'

সুকল্যাণ, প্রসূন, পল্টু মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। এর জন্য ওরা তৈরি ছিল না। স্যারের বকাঝকা ঠিক আছে, কিন্তু তা'বলে এভাবে অনুরোধ? তিনজনই খুব লজ্জা পেয়ে গেল। পল্টু আমতা আমতা করে বলল, 'পরশুর খেলাতেও আমরা যে হারব...। আর তারপর যদি বিশু আবার হাসে?'

বিজয়স্যার এবার রেগে গেলেন। গলা তুলে বললেন, 'গাধাটার হাসি আমি বের করছি। ফের যদি হেরে গিয়ে হাসে তাহলে ওকে স্কুল থেকে দূর করে দেব। তাছাড়া এটাই তো ওর শেষ ম্যাচ।'

টিফিনের সময় গাছতলায় আবার জরুরি মিটিং। বিশু স্কুলে এসেছে, কিন্তু মিটিঙে ডাকা হয়নি। গাছের ডালে বসে পল্টু বিজয়স্যারের কথা সবাইকে বিস্তারিত জানাল। তারপর ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাতে তুলে বলল, 'বন্ধুগণ, কোন উপায় নেই। স্যারের মুখরক্ষার জন্যই আমরা এবারের মতো বিশুকে ফিরিয়ে নিচ্ছি। আবার আমরা হারব এবং বিশু আবার হাসবে। কিন্তু সেটাই ওর শেষ হাসি হবে।'

কার শেষ হাসি, কে হাসে?

সেদিন খেলায় যা ঘটল তা আমরা কল্পনা করতেও পারিনি। গোটা স্কুলের কেউ-ই পারেনি। মাঠের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে থাকা মাস্টারমশাইরা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন। বিজয় স্যার ঘন ঘন নস্যি নিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘাড়ের কাছে গিয়ে হাঁচতে লাগলেন। এতে হেডমাস্টারমশাইয়ের খুব রেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি রেগে না গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'বিজয় তোমার নস্যির কৌটোটা একটা দাও তো। এক টিপ নিয়ে ফেলি। এই সময় মাথা পরিস্কার রাখাটা জুরুরি।'

আজকের খেলায় আমরা তিন-এক গোলে ক্লাস এইটকে হারিয়ে দিলাম!

সবাই চলে গেছে। আমরা ক্লাস সেভেনের ছেলেরা মাঠের এককোনায় গোল হয়ে বসে আছি চুপ করে জিতে এত ঘাবড়ে গেছি যে কথা বলতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। সন্ধে হতে আর দেরি নেই। অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

জেতার বিকেল বুঝি এত সুন্দর হয়!

হঠাৎ শুনি ফোঁপানির আওয়াজ। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটু দূরে বিশু হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। কাঁদছে নাকি! হ্যাঁ, কাঁদছেই তো! আরে, কাঁদছে কেন? জেতার পর কেউ কাঁদে নাকি! ছেলেটা সত্যি পাগল। হাফটাইমের পরে ও চার চারটে গোল না বাঁচালে আমরা আজ আবার হারতাম।

পল্টু উঠে গিয়ে বিশুর পিঠে হাত রাখল। বলল, 'অ্যাই বিশু, কাঁদছিস কেন? অ্যাই মুখ তোল। মুখ তোল বলছি। কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?'

বিশু মুখ তুলল। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,, 'কাঁদছি তো তোদের কী? আনন্দ হচ্ছে তাই কাঁদছি। প্লিজ, তোরা আমাকে কাঁদতে দে।'

আমরা ওকে কাঁদতে দিলাম।

এরপর বহু খেলায় আমরা জিতেছি , তেমনি অনেক খেলায় হেরেছিও। বিশু কিন্তু তার স্বভাব বদলায়নি। হেরে গেলে সে একইরকম ভাবে হাসে। তবে আমরা আর রাগ করি না। কারণ, আমরা বুঝতে পেরেছি, হারবার পর হাসা খুব কঠিন কাজ। এই কাজ সবাই পারে না। বিশুর মতো পাগলাটে ধরনের ছেলেরাই কেবল পারে। হারবার পর তারা মোটেও ভেঙে পড়ে না। বরং হাসতে হাসতে তারা নিজের জেদটাকে বাড়িয়ে নেয়। যাতে কোনও না কোনদিন জিতে খুব আনন্দ হয়। এত আনন্দ যে কান্না পেয়ে যায়।

ছবি : দেবব্রত ঘোষ

কল্পনা ও ছবি – গৌতম কর্মকার

কমান্ডার বোস

মহাকাশ পোকাগুলোর মস্তিষ্ক মনে হচ্ছে আমাদের মানুষগুলোর চেয়েও উন্নত। এতো সহজে ওরা
ফ্রেন্ডশিপের যাবতীয় কন্ট্রোলে শিখল কি করে?
এ কি কান্ড, সিস্টেমগুলো গণ্ডগোল করছে। ওরা নিশ্চয় গোপন কোন যন্ত্র ইনস্টল করে গেছে।
প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সিস্টেমগুলো কোন কমান্ড নিচ্ছে না!
FRIEND SHIP
টারসিয়ারি সিস্টেম একটা আছে, গোপন কোডও আমার জানা। দেখি কাজ হয় কিনা।
ইউরেকা – কাজ হয়েছে।
ঐ তো সিস্টেম অ্যানালিসিস করে স্পাই হার্ডওয়েরটা ধরে ফেলেছে।
যন্ত্রটা বসানো আছে ফ্রেন্ডশিপের ধাতব চাদরে। এক্সটার্নাল টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিচ্ছি, ওতেই কাজ হবে।
বৃহস্পতির আয়ো উপগ্রহ থেকে সংগ্রহ করা আশ্চর্য ধাতু 'গ্যালিলায়ো' দিয়ে তৈরী হয়েছে ফ্রেন্ডশিপ।
৫০০°… ৭০০°… হা হা হা – গ্যালিলায়োর কামাল। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ভিনগ্রহবাসীদের যন্ত্রটা।

সব সিস্টেম ঠিকঠিক কাজ করছে। আর কোন চিন্তা নেই। মানুষগুলো সব ডাটা নিশ্চয় সেভ করে রেখেছে। দেখি তো আগে কি ঘটেছিল।
অ্যাস্ট্রো-ওয়েব ইউলিসিস-এর রহস্যময় গতিবিধি— তারপর আর কোন এন্ট্রি নেই। আশ্চর্য!
FRIENDSHIP
ভিনগ্রহবাসীরা ইউলিসিসকে নিয়ে এত বড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল - এ যে ভাবা যায় না!
ইউলিসিস এখনো অ্যান্টি-চেম্বারে। তার মানে অ্যানালিসিস কমপ্লিট হয় নি।
উফ, আবার সেই রশ্মি! শয়তান পোকাগুলো নিশ্চয় ওর মগজে কোন যন্ত্র বসিয়ে রেখেছে।
দুঃখিত ইউলিসিস, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ আমার সামনে খোলা নেই।
৩৭

দুঃখ কোর না ইউলিসিস। তোমার নতুন মাথা তৈরী করে দেবো।
অপারেশন সাকসেসফুল। এবার আমাদের গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে। পোকাগুলো ওদের গ্রহে নিশ্চয় সংকেত পাঠিয়েছে।
যে কোন মুহূর্তে অচেনা কোন মহাকাশযান ধেয়ে আসতে পারে।
সবকিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক। মানুষগুলোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি।
গুড মর্নিং মালো, এমারসন, দুর্জয়। ঘুম ভালো হয়েছে তো?
আমাকে দুর্জয় বলে ডাকলো কেন? ডাঃ স্ফিংক্স-এর স্মৃতি কিভাবে ফিরে আসছে?
আশ্চর্য মানসিক ঝটকা! পুরো ঘটনাটা ওদের মগজ থেকে হাওয়া!
স্যার ফ্রেন্ডশিপের কন্ট্রোল এবার আপনার। আমি ঘুমোতে চললাম।
ও কি নিজেকে আগের মতো টিমস্মিথ ভাবতে শুরু করেছে?
শেষ
40

বৃষ্টির দিন

কালীকৃষ্ণ গুহ

বেলা কেটে যায়
বৃষ্টি দিন
কালো মেঘ আসে
এক দুই তিন

মেঘ বয়ে আনে
বিদ্যুৎ, ঝড়
মাঝে মাঝে কাঁপে
স্থির বাড়িঘর

ফাঁকা পথঘাট
নিশ্চুপ বাড়ি
মাথা-উঁচু গাছ
কত সারিসারি

সবকিছু ঘিরে
থাকে এক ভয়
ধীরে বয়ে যায়
জীবন, সময়।

এপথ দিয়েই

শৈলশেখর মিত্র

রাঙা মাটির ভাঙা পথে
যাচ্ছে দেখি গোরুর গাড়ি—
এলোমেলো দমকা হাওয়ায়
উঠছে দুলে গাছের সারি।
শালুক ফুলের তালুক বাঁয়ে
তারই পাশে অচিন গাঁয়ে
খড়ের চালা মাথায় নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে মাটির বাড়ি।
রাঙা মাটির ভাঙা পথে
হাড়জিরজির গোরুর গাড়ি।

আকাশ গাঙে জাল ফেলেছে
মেঘ দিয়ে কোন ইন্দ্রজালিক।
সেইখানে কী যাবে উড়ে
বকুল বনের দুষ্টু শালিক।
এপথ সরু ফিতের মতো
এপথ দিয়েই ইতস্তত
অনেক লোকে অনেকদূরে
অনেক দেশ দিচ্ছে পাড়ি।
রাঙামাটির ভাঙা পথে
ক্যাঁচর ক্যাঁচর গোরুর গাড়ি।

ছোট হই যদি

রূপক চট্টরাজ

চোখ মেলে দেখি সাতসকালেই
তুমুল বৃষ্টি শুরু —
মেঘের আওয়াজে পিলে চমকায়
বুক করে দুরুদুরু।
জল থইথই সারাটা উঠোন
পথ যেন সরু নদী,
এখন আমার বোনটার মতো
ছোট হয়ে যাই যদি।
রঙিন কাগজে জাহাজ বানিয়ে
ছেড়ে দেব ফাঁকা মাঠে
ভাসতে ভাসতে সে-জাহাজ ঠিক
পৌঁছবে বাবুঘাটে।

আকাশ বাতাস সব ভিজে ভিজে
পড়াতে বসে না মন
গাছাপালাগুলো সব জবুথবু
চারদিক নির্জন।
পুরোনো দিনের ইস্কুলবাড়ি
ডুবুডুবু গলা জলে
মজা হত, যদি সাঁতার দিতাম
একবার সক্কলে।

ও ছড়া কোথায় গেলি

চন্দন নাথ

যে ছড়া হঠাৎ এল মনের মাঝে
তাকে চাই খাতার পাতায় রাখতে ধরে
আমি যেই আঁকতে তাকে কলম তুলি
সে আবার উধাও হল অবাক করে!

বুঝি ও দুষ্টু ভীষণ! জানলা দিয়ে
ও কি ফের মুখ বাড়িয়ে মারবে উঁকি?
দুটো চোখ নাচিয়ে বুঝি ফের লুকোবে
খুশিতে বাজিয়ে তালি বলবে টুকি!

আমি তাই তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কোথায়—
সে যে আর দেয় না দেখা, লুকিয়ে থাকে
তবে কী ইচ্ছে আমার মিটবে না আর?
আমি কী পারব না আর আঁকতে তাকে?

কেবলই খুঁজতে থাকি হন্যে হয়ে
ও ছড়া, কোথায় গেলি? নিরুদ্দেশে?
আমাকে অমন করে খুঁজতে দেখে
কে যেন আড়াল থেকে উঠল হেসে।

কে যেন বলল, ওকে পারলে খোঁজো
ও এখন লুকিয়ে আছে পাতায়, ফুলে...
ওকে আজ পেতেও পার মেঘের বুকে...
ও এখন হয়তো ঝিনুক, নদীর কূলে...

আমি তো খুঁজছি ওকেই পাগল হয়ে
দেবে না কক্ষনো ও আর কী ধরা!
তোমাদের কেউ যদি পাও কোথাও দেখা
আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ো আমার ছড়া!

আগামী সংখ্যা

শারদীয়া সন্দেশ

বিশেষ আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথ ও র‍্যাচেল রোদেনস্টাইন-এর অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অপ্রকাশিত কবিতা

টিনটিন ৭৫ : সন্দীপ রায়

জঙ্গলের অ্যালবাম : সব্যসাচী চক্রবর্তী

হিরণ মিত্রের 'ছবি-লেখা'-র ছেলেবেলা

উপন্যাস ও বড়ো গল্প : শিশির কুমার মজুমদার (অপ্রকাশিত উপন্যাস), স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, শ্যামল দত্তচৌধুরী, সুলগ্না ঘটক

গল্প ও স্মৃতিকথা : জ্যোতিভূষণ চাকী, গৌরী ধর্মপাল, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী বসু, নবনীতা দেবসেন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণিমা রায়চৌধুরী, মিমি রাধাকৃষ্ণাণ, জয়া মিত্র, অশোক দাশগুপ্ত প্রমুখ

নাটক : সৌমিত্র বসু

কবিতা : শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমিতাভ চৌধুরী, কালীকৃষ্ণ গুহ, সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, অপূর্ব দত্ত, মন্দাক্রান্তা সেন, দীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ

আরও থাকছে চমৎকার সব প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, কমিক্‌স, কার্টুন ধাঁধা, প্রতিযোগিতা, দুর্দান্ত রঙিন পোস্টার, নিয়মিত সব বিভাগ ও আ-র-ও অনেক কিছু

গল্প বলার গল্প

সর্বজিৎ সেন

আগে যা ঘটেছে

আট বছর বয়েসি রূপু বেড়াল ভালোবাসে। একদিন বৃষ্টিতে ভেজা এক বেড়াল-বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে পড়ল ট্রাকের সামনে। আর দুর্ঘটনার পরেই দেখে কীভাবে যেন বেড়াল হয়ে গেছে সে! বেশ কিছু ভয়ানক ও মন্দ অভিজ্ঞতার পরে বেড়ালরূপী রূপুর একটা বিরাট প্রাপ্তি ঘটল— জেনি ওরফে যমুনাকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া। তার কাছে রূপু যেমন আশ্রয় পেল, তেমনি বেড়াল-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠও শিখে নিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যমুনা রীতিমতো মেম-ঘেঁষা। ওর মা-র দিদিমার দিদিমার দিদিমা ছিল দার্জিলিং-এ এক সাহেবের আশ্রয়ে। দিদিমা কলকাতার সাহেব পাড়ায় আর ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। ওর মালিক বাড়ি বদলানোর সময় যমুনাকে ভুলে চলে গেলে ক্ষুব্ধ যমুনা সেই থেকে রাস্তায়।

গঙ্গায় ডুবন্ত যমুনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে রূপু আর যমুনার বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়। এবার দু'জনে মিলে রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে লুকিয়ে চলল দার্জিলিং, যমুনার স্বজনের খোঁজে। কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা মন ভোলালেও দার্জিলিং-এর বাকি অভিজ্ঞতা হল বেজায় খারাপ। একদিকে, উন্নাসিক মাসি যমুনাকে আত্মীয় বলেই স্বীকার করল না, অন্যদিকে রাতের আশ্রয় গুদাম ঘরে আগুন লাগলে কিছু মানুষের দয়ায় কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচল ওরা। শেযমেশ, দু'জনেই সিদ্ধান্তে এল আর এখানে নয়, আপনার জায়গা— কলকাতাতেই ফেরা যাক।

ফিরে প্রথমেই ওরা গেল বুড়ো শিউপূজনের কাছে। শিউপূজন তাদের কী ভালোই না বাসত। কিন্তু এসে দেখল মারা গেছেন সেই বৃদ্ধ মানুষটি। ভীষণ মনখারাপের মধ্যে রূপুর বাবা-মাকে দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু গিয়ে দেখল বাড়িতে তালা বন্ধ। মাসিমণিও বিড়ালরূপী-রূপুকে চিনতে পারল না। ইতিমধ্যে হঠাৎ যোগাযোগে যমুনা তার পুরোনো মনিবদের ফিরে পেলেও স্বাধীন জীবনের আস্বাদ পাওয়ার পর , শত ভালোবাসাতেও আর বন্দি হতে রাজি নয়। দুজনে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিল রাসেল এক্সচেঞ্জের গুদামে। কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবন তাদের কপালে নেই। সেই হলদে গুণ্ডা হুলোটা যমুনাকে ডেকে গেছে। অথচ রূপু ওরকম একটা খুনে বদমাশের হাতে প্রিয়বন্ধুকে ছাড়তে নারাজ। অগত্যা 'ডুয়েল' লড়াই। সাংঘাতিক যুদ্ধে গুণ্ডা-হুলোকে পরাজিত ও নিহত করে বিধ্বস্ত রূপুও তলিয়ে গেল বিস্মৃতির কালো অন্ধকারে। তারপর ...

ষোল : ঘরের ছেলে ঘরে

গভীর অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে রূপুর কানে বাজছিল 'রূপু, রূপু, ফিরে এসো' 'খোকন, খোকন, ফিরে আয় বাবা'। একই রকম সুরে বাঁধা, একই রকম দুঃখী। কিন্তু গলা দুটো তো একজনের নয়।

অনেক কষ্টে চোখ মেলল রূপু। আলোকিত ঘর। সাদা দেওয়াল, সাদা খাট, সাদা বিছানার চাদর। তার উপরে মায়ের মুখ। মা ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন, 'খোকন, ফিরে আয় বাবা'। তাঁর দু-চোখে জল। কিন্তু যমুনা কোথায়?

ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে চারদিকে দু-চোখ বোলাল রূপু। খাটের পাশে চেয়ারে মা, খাটের পিছনে দাঁড়িয়ে বাবা, পাশে মাসিমণি-তুতুল-মিতুল-ডাক্তারজেঠু, আরও দুজন অচেনা ডাক্তার, একজন নার্স। কিন্তু পিছনের আয়নায় তো রূপুর মাথার সাদা লোম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আরে না, না, ওটা লোম নয়, ওর মাথা জুড়ে ব্যান্ডেজ। সারা গায়েও ব্যান্ডেজ।

এবার রূপু বলল, 'মা আমি কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হই হই করে উঠল।

মাসিমণি বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে'।

মা বললেন, 'তুমি হাসপাতালে, বাবা। এ কদিন এখানেই ছিলে।'

বাবা বললেন, 'ওয়েল ফট, মাই ব্রেভ বয়।'

ডাক্তারজেঠু বললেন, 'এ মিরাক্‌ল, নাথিং শর্ট অফ এ মিরাক্‌ল।'

অচেনা ডাক্তারদের মধ্যে একজন বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব হিম। এখন ওর আরও বিশ্রাম দরকার।'

নার্স দুটো তেতো বড়ি ওকে গেলাল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল রূপু।

এবার যখন ঘুম ভাঙল, দেখল মার কান্না-কান্না চোখে হাসির ছায়া। ব্যস্ত হয়ে রূপু বলল, 'কেঁদো না মা, আমি তো ভালো আছি।'

অপরিচিত ডাক্তারটি বললেন, 'দ্যাট্‌স লাইক এ ব্রেভ বয়।' বেশ কটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন ওঁরা। তারপর বললেন, 'কোয়াইট রিমার্কেবল। এরকম গভীর কোমা থেকে এরকম সুন্দর রিকভারি দেখতে পাওয়া যায় না।'

মা বললেন, 'সত্যি গত চারদিন কী অবস্থাতেই না ছিল!'

রূপু বলল, 'চারদিন বলছ কেন মা, চারমাস বল।'

সবাই তো অবাক! ডাক্তারজেঠু বললেন, 'এরকম হয়। কোমার পরে অনেকেরই সময়ের হিসেব গুলিয়ে যায়।'

আপত্তি করতে গিয়েও থেমে গেল রূপু। বড়োদের ব্যাপার তো, ওরা কিছু বিশ্বাসই করতে চায় না।

এবার সকলের কথা থেকে বোঝা গেল শনিবার সকাল নটায় ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তখুনি ওকে অ্যাম্বুলেন্সে উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওর হাতের হাড় সেট করা হয়, ব্যান্ডেজও করা হয়, কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসেনি। খবর পেয়ে বাবা সন্ধ্যার ফ্লাইটে এসে পড়েন। তখন ওকে ট্রান্সফার করা হয় আলিপুরে কম্যান্ড হসপিটালে। সেখানে রবিবার সকালে ব্রেন স্ক্যান করে দেখা যায় মাথার মধ্যে রক্তের একটা ছোট্ট ক্লট আটকে আছে। সোমবার সকালে অপারেশন করে ক্লটটা বার করা হয়েছে। সেই থেকে ওঁরা আশায় আশায় আছেন যে জ্ঞান ফিরে আসবে। সেই জ্ঞান ফিরল বুধবার বিকেলে।

এ কদিন মা, আয়াদিদি এখানেই ছিলেন। পালা করে মা আর আয়াদিদি রাত জাগছিলেন। পাশেই বাবার এক বন্ধুর কোয়ার্টার। সেখানে প্রয়োজন মতন বাবা-মা বিশ্রাম করেছেন। রূপু বলে ফেলল 'ওঃ, তাই বুঝি বাড়ি বন্ধ ছিল?'

মা তো অবাক! 'পুরো বন্ধ নয়, আয়াদিদি, মাঝেমধ্যে গেছে ও বাড়িতে। কিন্তু তুই জানলি কী করে?' উত্তর দেয়নি রূপু। বড়োদের বিশ্বাস কী?

সব টেস্ট হয়ে যাবার পর ঠিক হল কাল সকালে বাড়ি ফেরা। সকালেই ও নিজের শরীর পুরোটা আবার দেখল— বাঁ-হাত ভাঙা প্লাস্টার করা, মাথায় চোট ব্যান্ডেজ করা, পাঁজরে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো— তিনটে রিব ভেঙেছে, ভেঙেছে ডান পাও, ছোটো-খাটো চোট-আঘাত তো আছেই। রূপু নিজের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মনে মনে হাসল। কিছু বলল না।

বাড়ি যাবার সময় খাট থেকে নামতে বেশ লাগল, কিন্তু ও কিছুই বলল না। ওর বেড়াল জীবনের অভিজ্ঞতার পর এ কিস্যু না। বাবা ওকে বললেন, 'আই অ্যাম হ্যাপি দ্যাট ইউ হ্যাভ ফট লাইক এ ব্রেভ সোলজার। তুই লড়াই করে যুদ্ধে জিতেছিস।'

রূপু হঠাৎ বলে ফেলল, 'আগে শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। তারপর ঠিক করতে হবে, এখনই লড়াই করব, না পশ্চাদপসরণ করব। যদি লড়তেই হয়, নিজের সুবিধা অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্র বাছতে হবে। আর লড়তে হবে জেতার জন্য, শিভ্যলরি টিভ্যলরি আজকের দিনে চলে না।'

বাবা তো অবাক! বললেন, 'তুই এসব জানলি কী করে? এসব তো দেরাদুনে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির ক্লাসে আমাদের পড়াত।' লজ্জা পেয়ে রূপু চুপ করে গেল।

বাড়ি গিয়ে তো রূপু অবাক! গোটা বাড়িতে যেন উৎসব। টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বারান্দা থেকে। ঘরের মধ্যে কাগজের চেন আর বেলুন ঝুলিয়ে যেন স্বর্গপুরী। ওর জন্মদিনেও বোধহয় এত ঘটা হয় না। আর বাড়ি ভর্তি লোকজন- মাসিমণি, মেসো, তুতুল, মিতুল, কাকা-কাকিমা, দিদা, মামা-মামি আর ছোট্ট বিজু, বাবা-মায়ের বন্ধুরা, চাঁদ, জয়, মুন্না, মায় ডাক্তারজেঠু, পড়ার আরও দু-চারজন সব্বাই হাজির। সবাই হাসছে, চিৎকার করে বলছে, 'ওয়েলকাম হোম, রূপু (বা খোকন)'। খালি আয়াদিদি দরজা খুলে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল চোখ মুছতে মুছতে। ও একটু ছিঁচকাঁদুনে আছে, রূপু জানে।

তারপর বিরাট পার্টি। কেক কাটা হল। কেক, চিজ স্ট্র, ডালমুট, পিৎজা, আইসক্রিম খুব খাওয়া দাওয়া। চাঁদ, মুন্না, জয়, তুতুল, মিতুল সবাই ওর পায়ের প্লাস্টারে নাম সই করল। নিজেকে বেশ হিরো-হিরো লাগছিল রূপুর।

দিদা বললেন, 'যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল।'

রূপু বলল, 'আমি কিন্তু ভয় পাইনি একদম।' কেন জানি সব্বাই হো হো করে হেসে উঠল।

পার্টি শেষ হলে সবাই বাড়ি চলে গেল। রূপুর হাই উঠছিল। ওর খাটে মশারি গুঁজতে গুঁজতে মা বললেন, 'এখন কদিন বিশ্রাম। একটু গল্প-গুজব কর, টিভি দেখ, গল্পের বই পড় কিন্তু আরও মাস দেড়েক তো স্কুলে যেতে পারবে না। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। চাঁদকে বলেছি তোমাদের কী কী পড়া হল বলে দিতে। বাড়িতেই পড়িয়ে দেব এখন। কীরে, পারবি না?'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে রূপু বলল, 'কেন পারব না? প্র্যাকটিস করলেই পারব!' মা-বাবা একটু মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন।

এবার বাবা বললেন একগাল হাসি নিয়ে 'আয়াদিদি তোমার জন্য কী যেন এনেছে। দেখ তো, পছন্দ হয় কী না?'

আয়াদিদি দু-হাতে ধরে একটা বেতের বাস্কেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার মধ্যে একটা পুরোনো ছেঁড়া কাঁথায় খেলা করছে সেই ছাই-ছাই রঙের বেড়াল ছানাটা।

রূপুর হঠাৎ কী যে হল, হাত দিয়ে বাস্কেটটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কেন এনেছ এটাকে? যাও, সরিয়ে নিয়ে যাও। আমার যমুনা কই?' তার দু-চোখে তখন জল এসে গেছে।

বাবা-মা একটু অপ্রস্তুত। আয়াদিদির মুখটা ম্লান হয়ে গেল, বাস্কেটটা হাতে নিয়ে সে দু-পা পিছিয়ে গেল। রূপুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যমুনার কথাগুলো, 'দু-বছর স্বাধীন জীবন কাটিয়ে আমি আর কারোর পোষা হয়ে থাকতে পারব না, তা সে মানুষটি আমাকে যতই ভালোবাসুক না কেন।' আবার তার চোখ পড়ে গেল সেই ছাই-ছাই বেড়াল ছানাটার দিকে। ও বেচারা কেমন ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে। ও যাবে কোথায়? আবার রূপুর মনে পড়ে গেল নিজের কথা। একা একা ফুটপাথে জীবন কাটানো— সে কী সোজা কথা? যমুনার সাহায্য পেয়েছিল বলেই তো রূপু আজও বেঁচে আছে।

তাড়াতাড়ি রূপু বলল, 'স্যরি, আয়াদিদি। ওই বাচ্চাটাকেই আমি পুষবো। আমাকে দাও।'

আয়াদিদির মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা। তুই বিশ্বাসই করতে পারবি না, তোর আয়াদিদি কী করেছে। তোর অ্যাক্সিডেন্টের পর ওই বেড়ালছানাটকে ফুটপাথ থেকে তুলে এনেছে। জন্তু-জানোয়ার এত ভয় পেত ও, তোর কথা ভেবে ওকে দুধ-টুধ খাইয়ে মানুষ করেছে। যে কদিন ও হাসপাতালে ছিল, বেড়ালটাকে রেখেছিল ওর বোনের বাড়িতে। আজ এ বাড়িতে এনেও লুকিয়ে রেখেছিল তোকে সারপ্রাইজ দেবে বলে। আবার নাইয়ে ধুইয়ে পরিস্কার করে এনেছে।'

রূপু হেসে বলল, 'আরে, দাও দাও। তবে আয়াদিদি, ওকে চান করিও না, তার দরকারও নেই। বেড়াল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার প্রাণী। ওরা চেটে চেটেই নিজেদের সাফ করে। তবে চাটার অন্য উদ্দেশ্যও আছে।' তারপর বেড়ালছানাটাকে কোলের কাছে টেনে নিল। সে পরম আনন্দে চোখ বুজে ঘরঘর করতে লাগল।

ভালো করে ওকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল রূপু। ছানাটার গায়ের রং ছাই-ছাই হলেও মুখটা সাদা। আর কপালের মাঝখানে একটা টিপের মতন কালো ফুটকি। রূপু বলল, 'এটা ট্যাবি— সাহেবরা তাই বলে। এর নাম দেব ফুটকি, বাঘের মাসি!' ফুটকি পরম নিশ্চিন্তে ঘরঘর করতেই লাগল।

এসব কথা রূপু কাউকে বলেনি। বড়োদের কোনও কথা বলে লাভ নেই— ওরা কখন কী যে বলে আর কী যে করে তার কোন ঠিক নেই। তাই এতদিন পরে তোমাদের কাছে সব খুলে লিখে দিল। ও জানে, তোমরা এসব কথা ঠিকই বুঝবে, অবিশ্বাস করবে না। তবে, বড়োদের আবার বলো না যেন।

সমাপ্ত

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে

হ্রস্ব বিষয়ে দীর্ঘ বিবাদ/২

পাঁচ কথার প্যাঁচ

শুভেন্দু দাশমুন্সী

আজকের আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে সকলে অপেক্ষা করছিল ভোলানাথবাবুর জন্য। উনি বলে গেছেন আজ বলবেন, গতদিনের কথার খেই ধরে, কেন শ্রেণি-ধরণি-তরণিতে আজকাল হ্রস্ব-ই লেখা হয়। তার সঙ্গে আবার আগের দিন যাওয়ার সময় বলে গিয়েছেন, হ্রস্ব নিয়ে নাকি বিবাদ-বিসম্বাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। ফলে জানা নেই সেখানেই বা তিনি কী কথা বলবেন? তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে বুলবুল অন্য একটা কথা পাড়ল; বলল, 'আচ্ছা, নতুন বানানে তো বলা হয়েছে সংস্কৃত থেকে হুবহু যেসব শব্দ বাংলায় আসেনি, তাদের বানানে দীর্ঘ-ঈ লেখা চলবে না, তাহলে নিশ্চয়ই পাঁচালি বানানেও হ্রস্বই লিখতে হবে।'

'সে তো বটেই, লাবণ্য দ্রুত উত্তর দিলেন।

'আচ্ছা বেশ, তাহলে 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের আর সিনেমার বানান কী লিখব?'

'অবশ্যই হ্রস্ব-ই। কালাচাঁদ উত্তরটা দিয়ে নিজেই একটু থমকে গেল। বোধহয় ওর চোখের সামনে হ্রস্ব-ই দিয়ে 'পথের পাঁচালি' শব্দটা ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠল। একটু কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। টেবিলে ঝুঁকে একবার খসখস করে লিখল একটা কাগজে। তারপর আবার কেটে দীর্ঘ-ই দিয়ে 'পাঁচালী' লিখে একবার হাসল। এবার বেশ চেনা চেনা লাগছে নামটা। বুলবুলের সোজাসাপ্টা প্রশ্নটাকে আর অত সাদাসিধে মনে হচ্ছে না কারও।

লাবণ্যই বললেন, 'এটা তো বেশ গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে। আমরাই বলছি পাঁচালিতে হ্রস্বই লিখতে, শুধু পাঁচালি লিখছি যখন কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু যেই পথের পাঁচালি-তে হ্রস্ব-ই লিখছি, ওমনি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি এটাই ঠিক, কিন্তু চোখ মানতে পারছে না! ভারী অদ্ভুত ব্যাপার!'

বুলবুল বলল, 'শুধু এখানেই নয় আরও গোলমাল আছে। দেখুন, পূজা-তে দীর্ঘ ঊ, আর ধুলো-তে হ্রস্ব উ ঠিক আছে। কোনও সমস্যা নেই!'

সকলেই বলল, 'নাহ্। কোনও সমস্যাই নেই।'

বুলবুল বলে, 'কিন্তু ধরুন, পূর্ব থেকে যখন পুরবি হবে তখন? পুরবি তো আর সংস্কৃত শব্দ নয়। তাহলে 'পূরবী' লেখাও চলবে না। এবার ভাবুন দিকি অবস্থাটা।'

রিমঝিম ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, 'ইস আমরা মায়ের নাম পুরবি। উনি লেখেন, আমি লিখি পূরবী। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইয়ের নাম 'পূরবী'। এগুলোকে পুরবি লিখলে একদম ভাল্লাগবে না দেখতে।''

'এই দেখো— একে বলে অভ্যেস। ভোলানাথবাবু ভোকাবুলারি সভায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন। 'বানানের যতই নিয়ম হোক, অভ্যেসগুলো বেশ গণ্ডগোল করে দেয় সব নিয়মনীতিকে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, হ্যাঁ এটাই হওয়া উচিত, কিন্তু চোখ যেন মানতে চায় না কিছুতেই।'

'আপনি আসার আগে, লাবণ্যদিও ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন।' ভোলানাথবাবুকে বলল রিমঝিম। 'কিন্তু আপনার ওই শ্রেণি, ধরণি, তরণির কথাটা মনে আছে তো?'

'ওরে বাবা। সেটা মনে থাকবে না আবার? কিন্তু, তোমাদের এই অভ্যাসের কথার সঙ্গেই যুক্ত ওই শ্রেণি, ধরণি, তরণির হ্রস্ব-ই প্রসঙ্গ।'

'কী রকম?'

'অভিধান খুলে দেখো সংস্কৃত এইসব বানানেও হ্রস্বই দীর্ঘ-ঈ দুটোই ঠিক বলা আছে। তাই নতুন বানানের নিয়মে যেহেতু ঠিক করা হয়েছে, যেখানে হ্রস্ব-দীর্ঘ দুটোই ঠিক সেখানে হ্রস্ব-ই হ্রস্ব-উ-ই নেওয়া হবে, তাই ওইসব বানানে হ্রস্ব ই-হ্রস্ব উ নেওয়া হবে, দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ নয়। বুঝলে?''

'বুঝলাম বটে। কিন্তু এতদিনের অভ্যেস!' কালাচাঁদ একটু আমতা আমতা করে।

'সে তো বটেই। এই দ্যাখো না কেন— আজকের আনন্দবাজারটা নিয়ে এসো' ভোলানাথবাবুর কথায় বইয়ের তাক থেকে আজকের আনন্দবাজারটা নিয়ে এল কালাচাঁদ।

'এই দ্যাখো প্রথম পাতায় রেল বাজেট সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছে **'সব শ্রেণির যাত্রী ভাড়া ও পণ্য মাসুল অপরিবর্তিত** আবার এই যে, লক্ষ করে

দ্যাখো বড়ো বড়ো করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লেখার ওপরে লেখা '**ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক**'। এই পাতায় অভ্যাসের জেরে 'শ্রেণি' বানানে একজায়গায় হ্রস্বই এক জায়গায় দীর্ঘ-ই।''

'এই অভ্যেসের জন্যই পুরবি বানানে পথের পাঁচালির বানানে আমাদের চোখ ঠেকছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো বাংলা বানানে এতরকম বৈচিত্র্য আছে, তার যদি একটা সোজা পথ বেরিয়ে আসতে চায় বা যদি কেউ একটা সোজা পথ বের করতে পারে তাকে অভিনন্দন জানানোই উচিত।' ভোলানাথবাবু বললেন, 'আখেরে ভাষারই লাভ তাতে।'

'সে তো ঠিকই।' মোটামুটি সকলেই ভোলানাথবাবুর কথায় সায় দিল।

'কিন্তু'— আগের থেকে হঠাৎ গলা চড়িয়ে বেশ গলা খাঁকারি দিয়ে ভোলানাথবাবু বললেন, 'হ্যাঁ— কিন্তু। এই নতুন বানানেও অনেক গণ্ডগোল আছে। সেগুলো নিয়েও প্রশ্ন তোলা দরকার, কেউ কেউ তুলছেনও সেইসব প্রশ্ন, আর এইসব প্রশ্নোত্তর পর্ব পেরিয়েই হয়তো একদিন বাংলা বানানে সমতা আসবে একটা।'

'তবু দু-একটা গণ্ডগোলের কথা যদি বলেন।' কালাচাঁদ উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'সে বড়ো ঝামেলার ব্যাপার।' ভোলানাথবাবু একটু ইতস্তত বোধ করেন।

'না মানে তবু যদি একটু সোজা করে বলেন।' এবার আব্দার করে কালাচাঁদ।

'যেমন ধরো— আচ্ছা বলো তো পক্ষিশাবক, মন্ত্রিসভা বানানে হ্রস্ব ই, না দীর্ঘ ই?'

'অবশ্যই হ্রস্ব-ই।' জোরের সঙ্গে বলে কালাচাঁদ আর রিমঝিম।

'কিন্তু পক্ষী আর মন্ত্রী-তে দীর্ঘ ঈ।' যোগ করে বুলবুল।

'হ্যাঁ সেইভাবেই প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা-য় হ্রস্ব ই আর প্রতিযোগী, সহযোগী-তে দীর্ঘ-ঈ।' আরেকটু জুড়ে দেয় রিমঝিম।

'বেশ। এখন এই নতুন বানানে বলা হচ্ছে পক্ষীশাবক, মন্ত্রীসভা সবই দীর্ঘ-ই করে দাও।'

'কেন?' সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

'যুক্তি হল, সংস্কৃত পক্ষিন্, শশিন্, মন্ত্রিন্ শব্দগুলো যেহেতু দীর্ঘ ই-কার ওয়ালা রূপেই বাংলায় পরিচিত। অর্থাৎ, যেহেতু বাংলায় এগুলো পক্ষী, শশী, মন্ত্রী হিসেবেই বেশি চেনা, তাই এদের সঙ্গে কিছু যোগ করলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমতে হ্রস্ব-ই করার দরকার নেই। তাই গুণিজনের বদলে গুণীজন, মন্ত্রিসভার বদলে মন্ত্রীসভা পক্ষিকুল-পক্ষিশাবকের জায়গায় পক্ষীকুল-পক্ষীশাবক করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আবার বলা হচ্ছে যদি তা যোগ হয় তাহলে যেমন হ্রস্বই হোত তেমন হ্রস্বই-ই রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা মন্ত্রিত্ব-য় হ্রস্বই যেমনকার তেমন থাকবে।'

'হ্যাঁ, এতো যুক্তি হিসেবে বেশ গণ্ডগোলের ব্যাপার।' কালাচাঁদ রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছে।

ভোলানাথবাবু বলেন, 'তাছাড়া ভেবে দ্যাখো যদি বলি পক্ষী-গুণী-মন্ত্রীকে সংস্কৃত নয় বাংলা শব্দ হিসেবেই দেখব, তাহলে তো নতুন বানানমতে আর বানান হ্রস্বই হয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে দীর্ঘ-ই-ই বা থাকবে কেন! আবার যতই বলি না কেন, গুণিজন-পক্ষিশাবক বা মন্ত্রিসভাকে বাংলা বানাতে যাব কেন?'

রিমঝিম বলে, 'সত্যিই হ্রস্ব নিয়ে বিবাদ বড়োই দীর্ঘ।'

কালাচাঁদ একটু ঘাবড়ে গিয়ে একগ্লাস জল খেয়ে ফেলল।

তারপর বলল, 'আচ্ছা ভোলানাথবাবু আগের দিন আপনার ব্যাগেও ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণির বই দেখলাম কেন?'

'সে এক অন্য ব্যাপার— সেও এক মজার ব্যাপার। পরে বলব।'

'পরে বলতে সামনের দিন!' জিজ্ঞাসা করে কালাচাঁদ।

''না এর পরে তো পুজো। পুজোয় বরং অন্যভাবে অন্য আড্ডা হবে। পুজোর পরে আবার বলব ওই নতুন বইয়ের মজার ব্যাপার।'

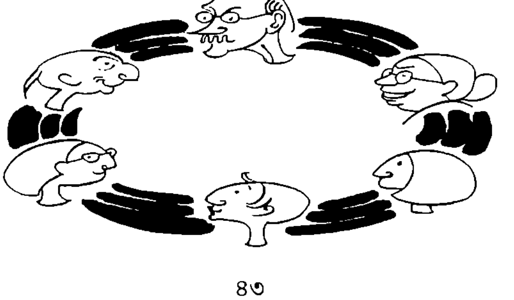

অঙ্কের মজা!

স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী

টুসিকে যখন উত্তরটা বলছিলাম ওকে কেমন অন্যমনস্ক লাগল। যেন শুনেও শুনছে না। বললাম, কীরে? বুঝতে পারলি তো?' টুসি গম্ভীরভাবে বলল, বুঝলাম, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকা মানেই কী শুধুই ধাঁধা?'

বললাম, 'ওয়েল, ওকে। কাল থেকে না হয় অঙ্কের মজা পাল্টে যাবে। কিন্তু এক্ষুনি যে আর একটা লজিক-ধাঁধা গলার নীচে আটকে আছে, সেটাকে নিয়ে কী করি?'

টুসি বলল, 'আজই শেষ কিন্তু, মনে থাকে যেন, কাল থেকে আর অঙ্কের মজা নয়, শুধুই মজা'।

বললাম, 'যো হুকুম রানিসাহেবা। প্রমিস। আর সেজন্যই আজকেরটার উত্তর বলার জন্য ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেব। শোন :

আরও একজন খুব বুদ্ধিমান ডাকাত ধরা পড়েছে। এও এতোই বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী যে দেশের নামী নামী লোকজনও একে সমীহ করে থাকেন। বিচার হল। মৃত্যুদণ্ড।

তবে বাঁচার জন্য ডাকাতকে একটা সুযোগও দেওয়া হল। তাকে রাখা হল জানলাহীন একটা ঘরে, যার দুটো মাত্র দরজা। দুই দরজায় দুই প্রহরী। এবং দুজনের মধ্যে একজন সবসময়েই সত্যিকথা বলে, অন্যজন সবসময়েই মিথ্যে।
দরজা দুটোর একটা মুক্তির দরজা। অন্যটা মৃত্যুর। ডাকাত যদি মুক্তির দরজা চিনে নিতে পারে, তাহলে সে মুক্ত। উপায়, সে দুজনের যে কোনও একজনকে একটিমাত্র প্রশ্ন করতে পারে।

ডাকাত এক মুহূর্ত ভেবে, যে কোনও একজন প্রহরীকে একটা প্রশ্ন করল কানে কানে। প্রহরী উত্তরে একটা দরজা দেখিয়ে দিল। ডাকাত তার উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য সেটাই মুক্তির দরজা।

এখন প্রশ্ন, ডাকাতের প্রশ্ন কী ছিল?

অঙ্কের মজায় টুসি এখন রীতিমত পারদর্শী। পাঁচমিনিট নয়, তিন মিনিটেই উত্তর বলে দিল।

ডাকাত একজন প্রহরীকে জিগ্যেস করেছিল, 'আমি যদি অন্য প্রহরীকে জিগ্যেস করি মুক্তির দরজা কোনটা সে কোন দরজাটা দেখাবে?'

প্রহরী যে দরজা দেখাল, মুক্তির দরজা তো ... তার উল্টোদিকে।

ভেবে দেখো। বেশি ব্যখ্যা করব না। খুব সহজ না কী ব্যাপারটা?

গতসংখ্যার উত্তর

ডাকাত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে সে 'আগুনে পুড়ে মরবে'। বিষয়টা কেমন দাঁড়াল। বিচারক কেন মুচকি হেসে তাকে ছেড়ে দিলেন?

কেননা, ডাকাতটিকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে গেলে দেখা যাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী তো সত্যি হচ্ছে, তাহলে তার জলে ডুবে মরার কথা। জল ডুবিয়ে মারতে গেলে দেখা যাবে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে— এবং তাহলে তাকে আগুনে পোড়ানো কথা।

ধাঁধার মধ্যে অসম্ভব আর একটা ধাঁধার সৃষ্টি হল। ডাকাত ছাড়া পেয়ে গেল।

'অঙ্কের মজা'র বেশ কিছু উত্তর আমরা পাচ্ছি। কিন্তু হাতে এসে পৌছোতে এতটাই দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, ঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, তার আগেই উত্তরসহ পরবর্তী সংখ্যাটা বের হয়ে গেছে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-এর একশো পঁচিশ বছর

ভূপতি চক্রবর্তী

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯ খিস্টাব্দের ১৪ মার্চ, জার্মানিতে। আজ থেকে ১২৫ বছর আগে। শোনা যায় শৈশবে তিনি কথা বলা শুরু করেছিলেন অন্য শিশুদের অনেক পরে এবং তাঁর পরিবারের সকলেই বিষয়টিতে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন।

বছর পাঁচেক বয়সে অ্যালবার্টের হাতে এল একটি কম্পাস যার দিগনির্দেশক ধর্ম তাকে বিশেষভাবে কৌতূহলি করে তুলেছিল। তিনি পরে বলেছেন যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি নিয়ে তার যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁকে জীবনভর চালনা করেছে তা সম্ভবত শুরু হয়েছিল কাকার কাছে থেকে পাওয়া কম্পাস নাড়াচাড়া করার মধ্যে দিয়ে।

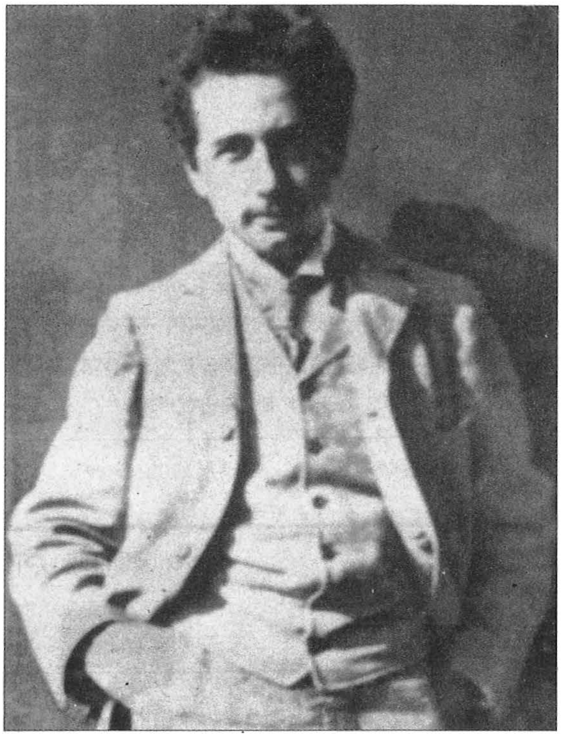

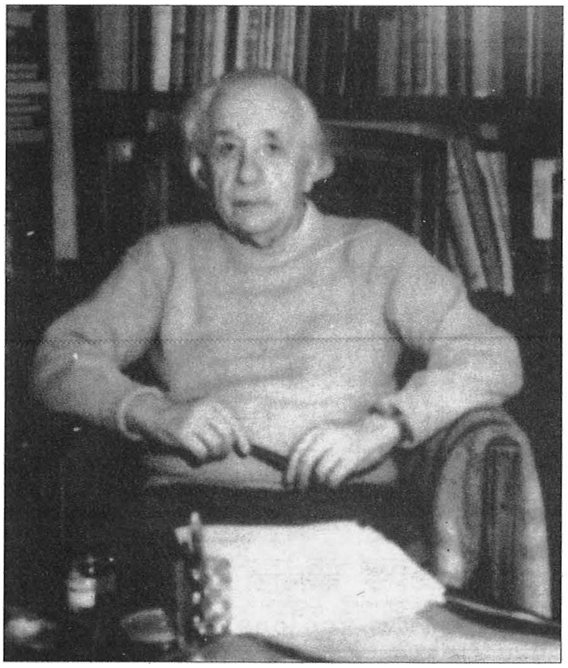

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানির পড়াশোনার মধ্যে সামগ্রিক নিয়মবদ্ধতা ছিল বেশ দৃঢ়। আইনস্টাইনকে ওই পড়াশুনা তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। ফলে স্কুলে ছাত্র হিসেবে কিছুটা দুর্বল তথা পিছিয়ে পড়া হিসেবে চিহ্নিত হতে হল পরবর্তী জীবনের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে। বস্তুত তিনি তাঁর স্কুলের পড়া জার্মানিতে শেষ করতে পারেননি।

যুগান্তকারী সব চিন্তাভাবনার সঙ্গে বেহালা বাজাতেন পাল তোলা নৌকোয় চড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। একইরকম এক ভালোবাসার ফসল তোমাদের জন্য হাজির করছি।

আইস্টাইনের তৈরি ধাঁধাঁ

আইনস্টাইনের মতে এই ধাঁধাঁ ছিল বেশ শক্ত, শতকরা আটানব্বই জনেরই অসাধ্য। তা তোমরা দেখবে নাকি চেষ্টা করে? না না মোটেই কোনও শক্ত অঙ্ক এতে নেই, আছে শুধু যুক্তি বিশ্লেষণের মেলা।

এক রাস্তায় পরপর পাঁচখানা বাড়ি রয়েছে। পাঁচটি বাড়ির প্রতিটির রং ভিন্ন আর সেগুলির প্রত্যেকটিতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক বাস করেন।

এঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও পানীয় পছন্দ করেন প্রত্যেকেই ধূমপান করেন এবং প্রত্যেকের বাড়িতেই রয়েছে পোষ্য প্রাণী।

তবে তাঁদের সকলেরই পানীয় কিংবা সিগারেটের ব্র্যান্ড বা পোষ্য প্রাণীটি আলাদা ধরনের—একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল নেই।

এবার প্রশ্ন : কে বাড়িতে মাছ রাখেন (বা কার পোষ্য প্রাণীই হচ্ছে মাছ?)

নাঃ এভাবে নিশ্চয়ই কোনও ধাঁধার উত্তর দেওয়া যায় না, সত্যিই তো এখন পর্যন্ত এই ধাঁধার ঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবার বরং আমরা নজর দিই এর সমাধানের জন্য আইনস্টাইনের দেওয়া সূত্রগুলির দিকে। উত্তরের খোঁজ কিন্তু মিলবে এখান থেকেই।

সংকেত

ব্রিটিশ নাগরিক বাস করেন লাল বাড়িতে। সুইডেনের নাগরিকের পোষ্য জন্তু হচ্ছে কুকুর। ডেনমার্কের মানুষটির প্রিয় পানীয় চা। রাস্তা থেকে দেখলে সাদা বাড়ির বাঁয়েই রয়েছে সবুজ বাড়ি। সবুজ বাড়ির মালিক কফির ভক্ত।

''পল মল'' ব্রাণ্ডের সিগারেট যিনি খান তিনি পাখি পোষেন। হলুদ বাড়ির বাসিন্দার পছন্দের সিগারেট ''ডানহিল'। ঠিক মাঝখানের বাড়ির মালিকের পানীয় হিসেবে পছন্দ দুধ। রাস্তার প্রথম বাড়িটিতে থাকেন নরওয়ের এক লোক। যে বাড়িতে বেড়াল রয়েছে তার প্রতিবেশি ভদ্রলোকটির প্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড হচ্ছে ''ব্লেন্ডস''। আর ধূমপায়ী হিসাবে যাঁর পছন্দ ''ডানহিল'' তাঁর প্রতিবেশি পোষেন ঘোড়া।

যে ভদ্রলোকের পছন্দের সিগারেট 'ব্লু মাস্টার' তিনি পান করতে ভালোবাসেন বিয়ার। সুপুরুষ জার্মান ভদ্রলোকের ''প্রিন্স'' ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্রতি বিশেষ টান। নরওয়ের নাগরিক বাস করেন নীল রঙের বাড়ির ঠিক পাশেরটাতে।

''ব্লেন্ড' ব্রান্ডের সিগারেট যিনি নিয়মিত খান তাঁর এক প্রতিবেশীর প্রিয় পানীয় জল। সবশেষে আবার প্রশ্নটা রাখা যাক মাছ পোষেন কোন ভদ্রলোক?

ধাঁধার উত্তর ৬৯ পৃষ্ঠায়

৯০ বছরের সেরা ছোটদের পত্রিকা

সন্দেশ

মাসে মাসে পাবার মতো মজা আর নেই
তাই
তাড়াতাড়ি সন্দেশ-এর গ্রাহক হয়ে যাও, বন্ধুদেরও গ্রাহক করে দাও

গ্রাহক চাঁদা	এক বছর	দুই বছর	তিন বছর
হাতে নিলে	১২০৲	২২০৲	৩২০৲
ডাকে নিলে	২০০৲	৩৮০৲	৫০০৲

যোগাযোগ : সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০ ০২৯
বই পাড়ায় : এ১৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট কলকাতা ৭০০ ০০৭

হৃৎস্পন্দন ও মায়া সভ্যতা

তাপস ভট্টাচার্য

আমাদের হৃৎস্পন্দনের হার কত? যারা ক্লাস ফাইভ, সিক্সে উঠেছে তারা হয়তো এখুনি বলে দেবে, কেন মানুষের হৃৎপিণ্ড তো মিনিটে ৭২ বার চলে।

একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা মাথা নেড়ে জানাবে, আসলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের গড় গতি হল ৭২। প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দন ৬০ থেকে ১০০-র মধ্যে থাকলে তাকে স্বাভাবিক বলা হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রের পড়ুয়ারা বলবে। ৬০-এর নীচে হৃৎস্পন্দন হলে তা স্বাভাবিকের চেয়ে কম। একে ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলা হয়। ১০০-র বেশি হৃৎস্পন্দনের হারকে স্বাভাবিক থেকে বেশি বা ট্যাকিকার্ডিয়া বলা হয়। নাড়ির হার স্বাভাবিকের ওপরে বা নীচে থাকলে শরীরে নানা রকম রোগ বাসা বেঁধেছে বলে বোঝা যায়।

গাড়ির গতির এই কমা বাড়ার সঙ্গে রোগের যে সম্পর্ক তা নিয়ে আমরা আজ হিসেব করতে বসিনি। আমরা খুঁজতে চাইছি মায়া সভ্যতা ধ্বংস হবার কারণ।

কোন্ মায়া সভ্যতা? সেই যে মধ্য আমেরিকায় ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে শুরু হওয়া আশ্চর্য জনপদ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আজকের হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা আর মেক্সিকোর উত্তরের কিছু এলাকা নিয়ে এই মায়া সভ্যতা ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে। এরা জঙ্গল কেটে বসতি করেছিল, চাষবাস শিখেছিল। পাথর দিয়ে বানানো বড়ো বড়ো শহরগুলো বিশাল এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি হয়েছিল মধ্য আমেরিকার ওই রুক্ষ অঞ্চলে। প্রত্যেক শহরের মাঝে যোগাযোগের জন্য ছিল মাইলের পর মাইল একেবারে সোজা, মজবুত রাস্তা, আজও তা আধুনিক মানুষকে অবাক করে। বড়ো শহরগুলোতে একসঙ্গে ৪০,০০০ মানুষও থাকত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে এদের ছিল দারুন দখল। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের সময় নিখুতভাবে মিলিয়ে দিতে পারত এরা। ১ আর ৫ অঙ্কের সংকেত দিয়ে এই মানুষের কয়েক লক্ষ পর্যন্ত গোনার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল।

কঠিন পরিশ্রম আর শৃঙ্খলায় গড়ে তোলা এই বিশাল সাম্রাজ্য হঠাৎই ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সোনালি দিনগুলো ঢাকা পড়ল দুঃসময়ের অন্ধকারে। এমন একটা জমকালো, ব্যস্ত, শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা ভেঙে পড়ল একেবারে আচমকা। শহর ভেঙে মানুষগুলো চলে চলে গেল কোন্ অনির্দিষ্ট তাগিদে তারও কোনও হদিশ নেই গবেষকের খাতায়।

এই নিয়ে অনেক তত্ত্ব তালাশ হয়েছে। কেউ বলেছে, এখানের জমি উর্বরাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কেউ জানিয়েছে রোগ আর ভূমিকম্পের কথা। কারও মতে মেক্সিকো থেকে আসা যুদ্ধবাজ আজটেক মানুষের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে মায়া সভ্যতা।

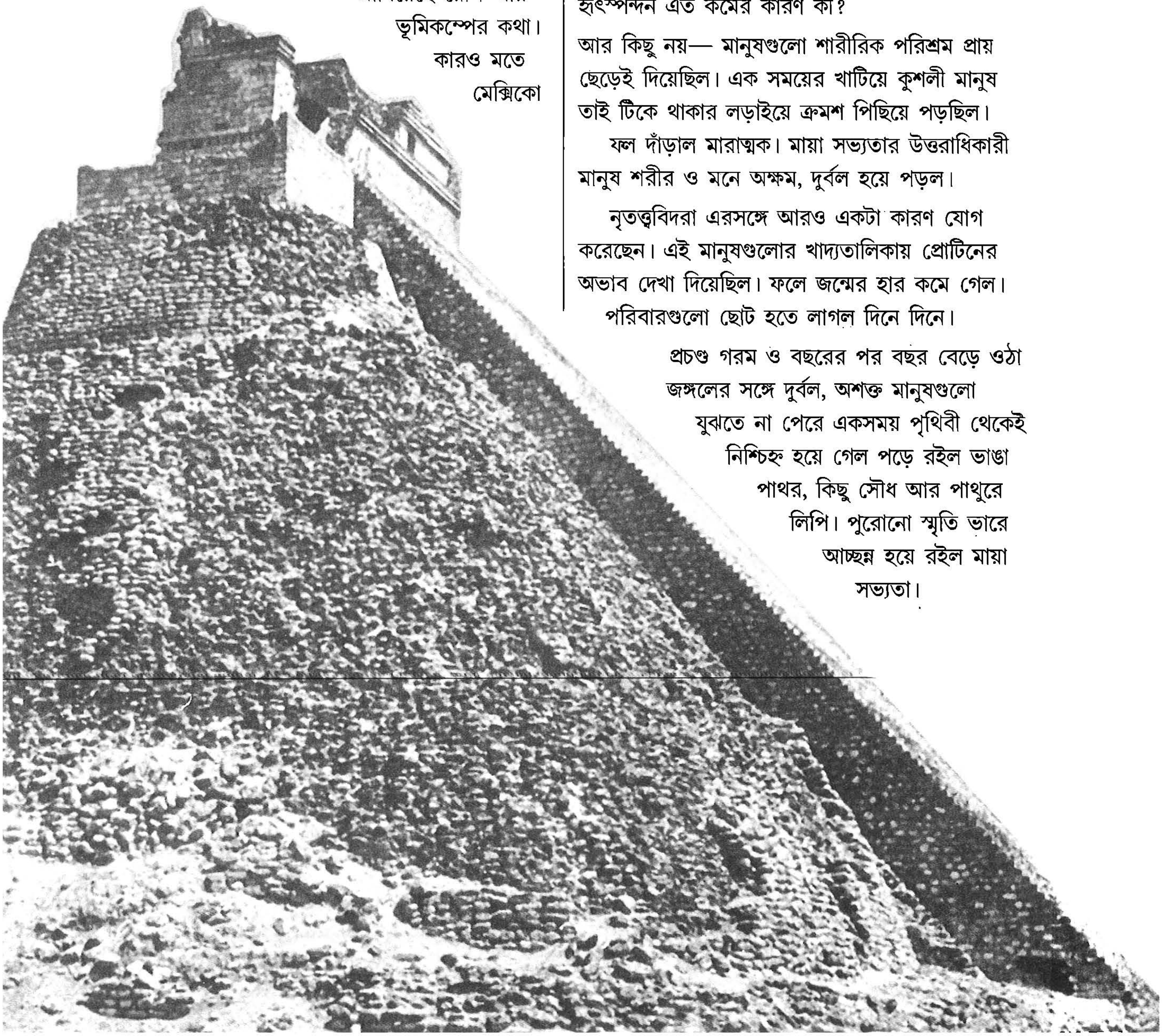

তবে সবচেয়ে চমক লাগানো কারণ জানিয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোকজন। তাঁদের ধারণা মায়া সভ্যতার মানুষেরা বেঁচে থাকার লড়াই সম্বন্ধেই উদাসীন হয়ে পড়েছিল। জঙ্গলের ভেতর বহু বছরের নিরাপদ অস্তিত্ব তাদের অলস করে তুলেছিল।

কীভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এমন এক তত্ত্ব দাঁড় করালেন? কী এমন প্রমাণ পেলেন এই গবেষকরা?

গবেষকরা জানতে পেরেছেন মায়াসভ্যতার মানুষের নাড়ি স্পন্দন ছিল বেশ কম। তাঁদের হিসেবে এই হার ছিল প্রতি মিনিটে ৫২ বার। তার মানে তাদের হৃৎপিণ্ডের চলার হারও এই একই।

হৃৎস্পন্দন এত কমের কারণ কী?

আর কিছু নয়— মানুষগুলো শারীরিক পরিশ্রম প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। এক সময়ের খাটিয়ে কুশলী মানুষ তাই টিকে থাকার লড়াইয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল।

ফল দাঁড়াল মারাত্মক। মায়া সভ্যতার উত্তরাধিকারী মানুষ শরীর ও মনে অক্ষম, দুর্বল হয়ে পড়ল।

নৃতত্ত্ববিদরা এরসঙ্গে আরও একটা কারণ যোগ করেছেন। এই মানুষগুলোর খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের অভাব দেখা দিয়েছিল। ফলে জন্মের হার কমে গেল। পরিবারগুলো ছোট হতে লাগল দিনে দিনে।

প্রচণ্ড গরম ও বছরের পর বছর বেড়ে ওঠা জঙ্গলের সঙ্গে দুর্বল, অশক্ত মানুষগুলো যুঝতে না পেরে একসময় পৃথিবী থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পড়ে রইল ভাঙা পাথর, কিছু সৌধ আর পাথুরে লিপি। পুরোনো স্মৃতি ভারে আচ্ছন্ন হয়ে রইল মায়া সভ্যতা।

নোটাফিলি সংগ্রহ

সৌভিক মুখোপাধ্যায়

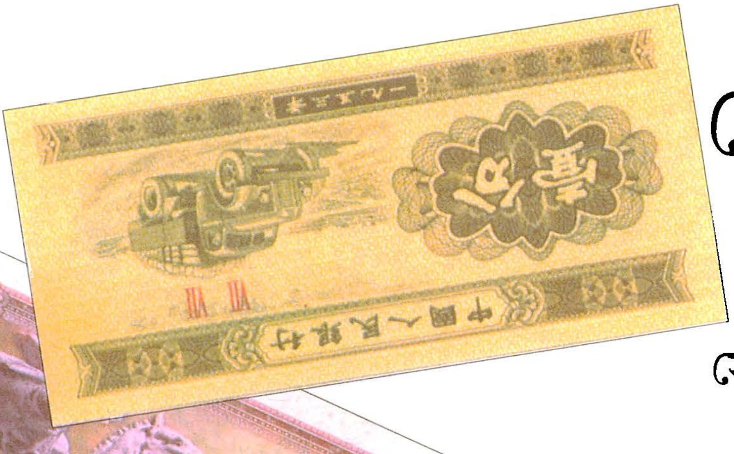

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পুরোনো দিনের টাকা বা পেপার- মানি সংগ্রহ করার জন্য কী'ই না করেন। কারণ, এই সংগ্রহ যেমন কষ্টের তেমনি ঠিক করে রাখা আরও কষ্টের। কাগজের টাকা বা পেপারমানির সংগ্রহকে **নোটাফিলি** (Nota phily) সংগ্রহ বলা হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর একজন গভর্নর থাকেন। এক টাকার নোট ছাড়া সব নোটেতে তাঁরই সই আমরা দেখতে পাই। যে সময় যে গভর্নর, সেই সময়ের ছাপা টাকাতেও তাঁর সই থাকে। এখন অবধি আঠারো জন গভর্নর হয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষে। স্বাধীন ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম গভর্নর ছিলেন, সি. ডি. দেশমুখ (১১-৪-১৯৪৩ —৩০-০৬-১৯৪৯) তিনি স্বাধীনতার আগে থেকেই গভর্নর ছিলেন, তাই ভারত স্বাধীন হবার পর তার আমলেই ইয়া বড়ো বড়ো দশ টাকার নোট ছাপা হয়েছিল। সেই নোট ছিল প্রধানত খয়েরি আর সবুজ রং-এর, ছিল ১৪৬ x ৮৩ মিমি. সাইজের একপিঠের মাঝখানে শুধু ইংরেজিতে লেখা ছিল টেন রুপিজ আর ডান পাশে ৮ খানা (আট খানা) ভাষাতে লেখা ছিল দশ কথাটা, উল্টো দিকে ছিল একটা পাল তোলা নৌকার ছবি। সই ছিল সি.ডি. দেশমুখ, এই নোটের প্রিফেক্স (Prefix) ছিল "A" আর কোন ইনসেট (Inset) ছিল না।

এবার তাহলে জানতে হবে 'প্রিফেক্স' কী আর 'ইনসেট'ই বা কী। জাল নোট আটকাবার জন্য আর কত টাকা ছাপানো হল তার একটা হিসাব রাখার জন্য টাকাতে যে "অক্ষর জল ছাপ" থাকে তাকেই আমরা প্রিফেক্স বলি। আর দেখবে নোটের গায়ে যে নম্বর থাকে তার আগে একটা অক্ষর থাকে, তাকে আমরা ইনসেট বলি। জাল নোট আটকাবার জন্য, সবসময় এই অক্ষরগুলো পরিবর্তন করা হয় অনেক সময় আবার প্রিফেক্স থাকলে ইনসেট থাকে না বা তার উল্টোটাও হয়। ধরা যাক, একটা নোটের নম্বর ১০০০, প্রিফেক্স "B" ইনসেট "G", আমরা বলতে পারি যে B প্রিফেক্সের G ইনসেটের ১০০০ নম্বরের নোট।

সুতরাং যদি কেউ স্বাধীন ভারতের নোটের সংগ্রহ করতে চাও তবে প্রথমে জানতে হবে কতজন গভর্নর এখন অবধি হয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কারণ প্রত্যেকটি গর্ভনরের সই করা নোট দিয়ে শুরু করা ভালো। আগেই বলেছি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এখন অবধি আঠারো জন গভর্নর হয়েছেন। এদের মধ্যে আবার অনেকের আমলে দু'টাকার নোট

থেকে শুরু করে হাজার টাকার নোট সব ছাপা হয়েছে। আবার ধরো প্রথম বাঙালি গভর্নর পি. সি. ভট্টাচার্যর সময় কেবল মাত্র দুই, পাঁচ আর দশ টাকার নোট ছাপা হয়েছিল। এই সব সমস্ত গর্ভনরের সই করা সমস্ত নোট কালেকসনে এলে তোমরা যেতে পার ইন্ডেক্স আর প্রিফেক্স ধরে ধরে আরো ডিটেল কালেকসনে।

সন্দীপ রায়ও তাঁর ফটিকচাঁদ সিনেমাতে পুরোনো টাকা ব্যবহার করেছিলেন কারণ নোট সেই সময়টাকে বোঝায়।

কদিন আগেও এই সম্বন্ধে খুব একটা ভালো বইপত্তর ছিল না এখন একটু খোঁজ করলে, সাউথ এশিয়ান কয়েন ক্যাটালগ বা "Philatelia" এক নম্বর মোতি শীল স্ট্রিটের দোকানে গিয়ে অনেক পেতে পার।

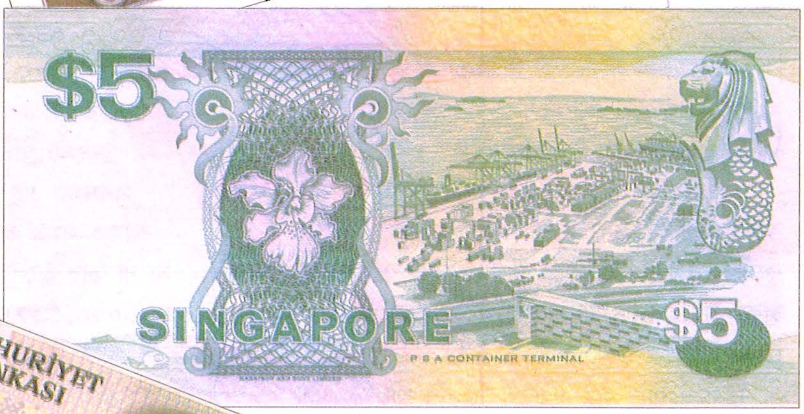

বিভিন্ন দেশের টাকা

পূর্ব প্রকাশিতর পর

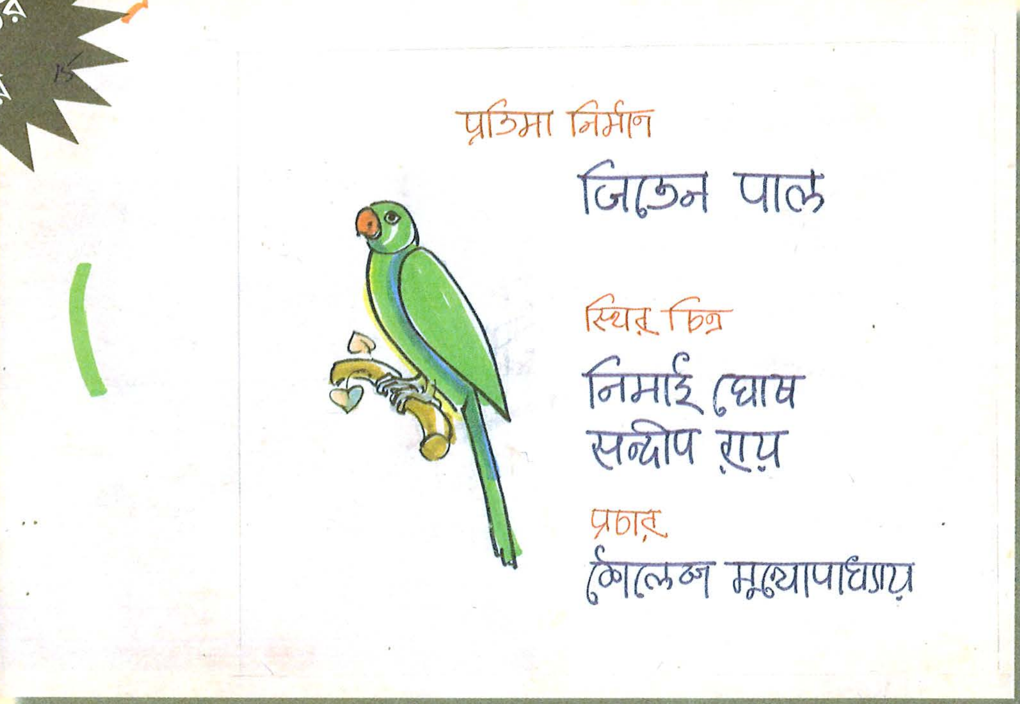

জয় বাবা ফেলুনাথ

চিত্রনাট্য : প্রথম খসড়া

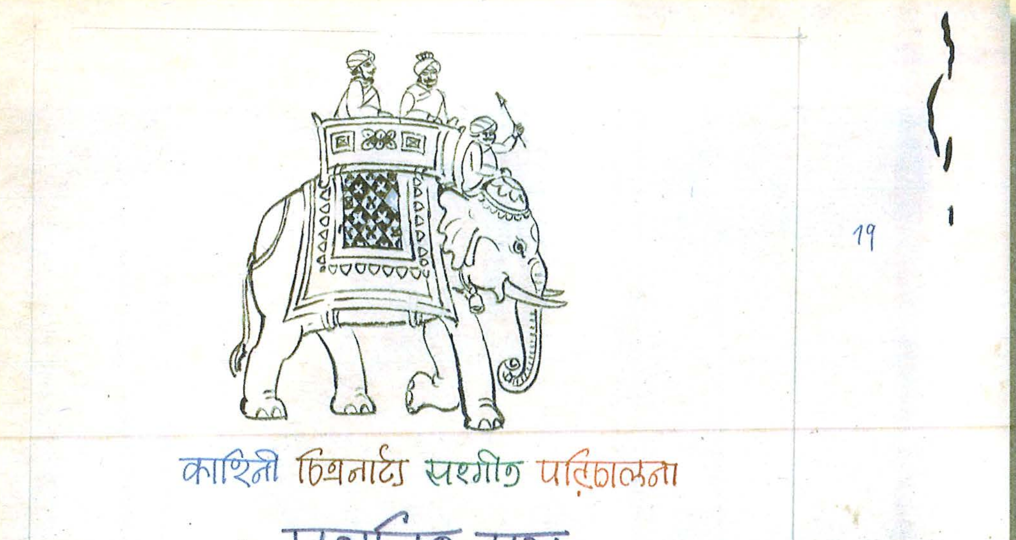

ROOM NO 3 / CALCUTTA LODGE / DAY

বিশ্বশ্রী গুণময় বাগচী তার main muscles-গুলোর নাম বলে দিচ্ছেন, লালমোহন একটা খাতায় নোট করে নিচ্ছে।

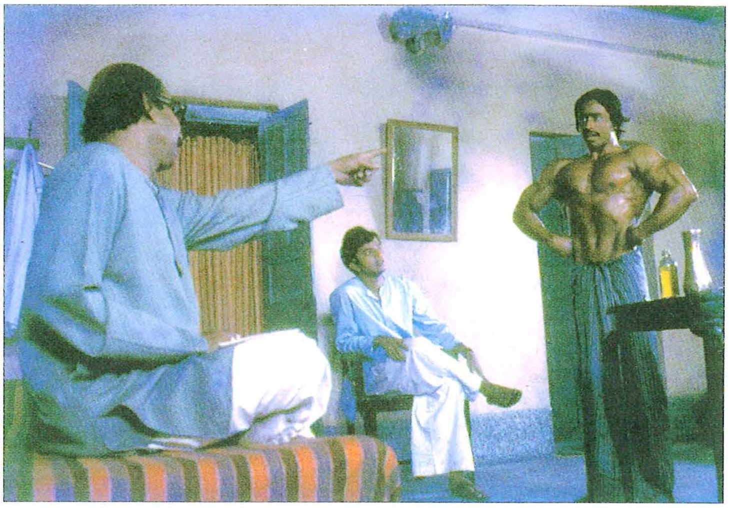

গুণ এইটে হল mastoid — এইয়ে—

লাল (writing) Mas-toid — বেশ—

গুণ আর এইটি Trapezius—

লাল Tra— বানানটা?

হোটেলের চাকরের প্রবেশ। তোপ্‌সে লালমোহনের কাণ্ড দেখছিল, চাকর তাকে উদ্দেশ্য করে বলে—

চাকর আপনার টেলিফোন।

তোপ্‌সে (অবাক) আমার?

তোপ্‌সে বেরিয়ে যায়।

গুণ T-R-A-P-E...

MANAGER'S ROOM

নিবারণ টেলিফোনটা হাতে নিয়ে আছে— সেটা তোপ্‌সেকে দেন।

চক্র তোমার দাদা—

তোপ্‌সে হ্যালো—

ফেলু (os) শোন্— খুব মন দিয়ে শোন্—

তোপ্‌সে হ্যাঁ—

ফেলু (os) আজ বিকেলে ছটার মধ্যে তোরা চৌষট্টি ঘাটে চলে আসবি

তোপ্‌সে আচ্ছা—

ফেলু (os) মছলিবাবার কাছাকাছি থাকবি—

তোপ্‌সে আর তুমি?

ফেলু (os) আমিও আসব। আর চারটে নাগাৎ— শুনছিস্ ত?

তোপ্‌সে হ্যাঁ হ্যাঁ—

ফেলু (os) চারটে নাগাৎ বেঙ্গলি ক্লাবের একটি ছেলে— নাম সুশান্ত বোস— তোদের ওখানে গিয়ে কিছু মেক-আপের জিনিস দেবে। তোরা সেগুলো ব্যবহার করবি। তোদের যেন চেনা না যায়।

তোপ্‌সে বুঝেছি।

ফেলু (os) আর একটা কথা— ঠঠেরি বাজারে রামভাণ্ডার হচ্ছে বেনারসের সবচেয়ে বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। সেখান থেকে এক হাঁড়ি ভালো মিষ্টি কিনে নিয়ে আসবি। আমি এখনো পর্যন্ত খাবার time পাইনি— আর সন্ধের মধ্যে পাবোও না। বুঝেছিস?

তোপ্‌সে হ্যাঁ হ্যাঁ— কিন্তু ...

কট্ আওয়াজ শুনে বোঝা যায় ওদিক থেকে ফেলু ফোন রেখে দিয়েছে।

দৃশ্য ৯

CHOWSHATTI GHAT / LATE AFTER NOON

মছলিবাবার আসর বসেছে। ভজন হচ্ছে, মছলিবাবা তালে তালে দুলছেন। ডান পাশে যথারীতি মাছের আঁশ রাখা রয়েছে। একজন ভক্ত বাবাকে এসে প্রণাম করলেন, বাবা তাকে একটি আঁশ দিলেন।

ঘাটের উত্তর দিকে থেকে (অর্থাৎ দশাশ্বমেধের দিক থেকে) একজন মাঝবয়সী জটাধারী গেরুয়াপরা সাধু ও তার সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক অল্প গোঁফ-দাড়ি সম্বলিত সাধু আসরের দিকে এগিয়ে আসে। এরাঁ হলেন লালমোহনবাবাজী ও তোপ্‌সেবাবাজী। এদের মধ্যে প্রথম জন সাধুসুলভ অঙ্গভঙ্গী করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন বলে দ্বিতীয় জন তার দিকে শাসনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। তোপ্‌সের হাতে একটা গেরুয়া পুঁটলিতে মিষ্টির হাঁড়ি রয়েছে।

দুজনে এগিয়ে এসে মছলিবাবার আসরের কাছেই গঙ্গার ধারে একটা বুরুজের উপর আশ্রয় নেয়।

লাল ব্যোম্ ভোলানাথ! (গলা নামিয়ে) তোমার দাদাটিকে দেখতে পাচ্ছিনা ত।

তোপ্‌সে (ফিস্‌ফিস্) যখন বলেছে তখন ঠিক আসবে।

লাল ছ'টা বেজে পাঁচ।

তোপ্‌সে (চোখ ছানাবড়া) একী- আপনার Wrist watch পরে আছেন?

লালমোহন জিভ কেটে আলখাল্লায় ঘড়ি ঢেকে ডান হাত দিয়ে সেটা খুলে আলখাল্লার পকেটে চালান দেয়।

ভজন হয়ে চলেছে। বাবাজী তালে তালে দুলছেন, গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছে।

লালমোহন, তোপ্‌সে তাদের জায়গায় বসে আছে। তোপ্‌সের দৃষ্টি পিছন দিকে যায়। সে লালমোহনকে কুনুই দিয়ে একটা খোঁচা মারে। লালমোহন পিছন ফিরে

দেখে মগনলালের বজরা আসছে! মগনলাল ছাতে বসে আছে।

লাল Pulse rate বেড়ে যাচ্ছে তপেশ ভাই। তোমার দাদা বড় চিন্তায় ফেললেন।

মগনলালের বজরা আরো এগিয়ে এসেছে।

লালমোহন তার গেরুয়া চাদরটা আরো ভালো করে জড়িয়ে নেয়।

লাল ব্যোম্ ভোলানাথ! শিবশঙ্কর শম্ভু!

ভজন চলতে থাকে।

এই সময় আরেকটি শ্মশ্রুজটাধারী সাধু এসে লালমোহন ও তোপ্‌সের পাশে বুরুজের উপর এঁদের দিকে পিঠ করে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে।

লালমোহন এই নতুন সাধুটিকে শুনিয়ে গালবাদ্য করে। তোপ্‌সে তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙায়— ভাবটা : এতটা বাড়াবাড়ির দরকার নেই।

এবারর তোপ্‌সের দৃষ্টি নবাগত সাধুটির দিকে যায়।

এই কি ফেলু নাকি?— তাদেরই মতো ছদ্মবেশে এসেছে সে? লালমোহন-তোপ্‌সের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। দুজনেরই মনে একটা সন্দেহ। লালমোহন একই ঝুঁকি নেয়। মিষ্টির হাঁড়িশুদ্ধ বোঁচকাটা সাধুর দিকে খানিকটা ঠেলে দেয়।

লাল মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ! — ব্যোম ভোলানাথ!

এতে কোনো ফল হয়না। সাধু অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

লালমোহন - তোপ্‌সে আবার চোখ চাওয়া- চাওই করে। লালমোহন এবার আরেকটা ফন্দি করে।

লাল মিত্রস্য মিত্রাঃ অত্র উপস্থিতং— শিবশঙ্কর শম্ভু!

এবার মগনলালের বজরা এসে ঘাটে লাগে। মগনলাল বজরা থেকে নামে।

লাল (গলা নামিয়ে) মগনলাল আগচ্ছতি।

তোপ্‌সে চারিদিকে দেখছে ফেলুর জন্য। আবার দুজনে পরস্পরের দিকে দেখে। ফেলুর কোনো পাত্তা নেই। লালমোহন তাও আর ভূমিকা পালন করে যেতে চেষ্টা করে। ভক্তিভাব আনা মুশকিল, তবু সংস্কৃতটা চালিয়ে যায়।

লাল সর্বনাশে সমুৎপন্নে... সর্বনাশে সমুৎপন্নে...

তোপ্‌সে (ফিস্‌ফিস্) ফেলুদা কিন্তু থাকতে বলেছে ...

এবার আমরা আবার মছলিবাবার আসরে যাই।

মগনলাল ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে । ভজন এখনো চলছে।

মগনলাল বাবাজীকে প্রণাম করে লাল রেশমে মোড়া একটি প্যাকেট মছলিবাবার দিকে এগিয়ে দেয়। মছলিবাবা তার লাল চাদরের মধ্যে দিয়ে বাঁহাত বার করে সেটি গ্রহণ করে। পরমুহূর্তে আরেকটি জিনিস চাদরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। সেটা হল মছলিবাবার ডান হাতে ধরা revolver -এর মুখটা।

মগনলাল নত অবস্থা থেকে মাথা তুলে revolverটা চোখে পড়তেই তার মুখের ভাব আশ্চর্যভাবে বদলে যায়। সে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। এবার সে মুখ তোলে এবং দেখে বাবাজী পরপর পরচুলা,দাড়ি এবং গোঁফ খুলে ফেললেন। ইনি আসলে ছদ্মবেশী ফেলু।

ফেলু   শুধু ঘুঘুই দেখেছ মগনবাবু — ফাঁদ ত দেখনি।

মগনলাল কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে পিছোতে থাকে। ভক্তরা দলেদলে পলায়ন শুরু করে।

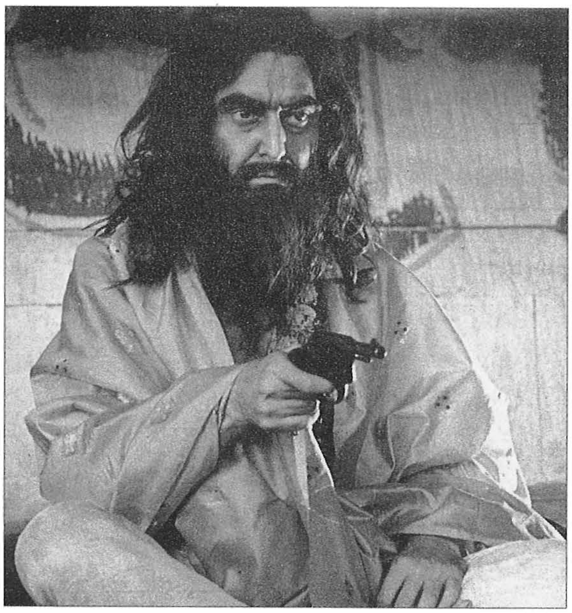

ফেলু রিভলবার হাতে বেদী থেকে নেমে এসে মগনলালের দিকে এগিয়ে যায়।

তোপ্‌সে - লালমোহনও এগিয়ে এসেছে কাণ্ড দেখতে— তাদের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

মগনলাল পিছোচ্ছে। এখন সে সম্পূর্ণ ফেলুর হাতে।

ফেলু   আপনার সাজানো বাবাজীর এখন আঁশ ছাড়ানো হচ্ছে কোতওয়ালিতে— বামালসমেত গ্রেপ্তার!

মগনলাল ক্রমে পাথরের দেয়ালের দিকে পিছোচ্ছে। তোপ্‌সে লালমোহন সাহস করে আরো এগিয়ে এসেছে। এবার দেখা গেল ইন্‌স্পেক্টর তেওয়ারি এবং পুলিশের দলও উপস্থিত। তারা অবশ্যি এই ঘটনার জন্য তৈরিই ছিল।

ফেলু এবার আমার প্রাইভেট সার্কাসের খেল যে একটু দেখতে হবে মগনবাবু! দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ন ত দেখি!

এতক্ষণে মগনলালের কাতর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মগন আপনি কতো টাকা চান বলুন, মিস্টার মিত্তির! আপনি কতো টাকা চান বলুন—

ফেলু যারা গুণ্ডা দিয়ে নিরীহ লোককে খুন করায়—

ফেলুর revolver গর্জন করে ওঠে। প্রথম গুলি দেয়ালে লাগে মগনলালের বাঁ কাঁধের দুইঞ্চি পাশে।

ফেলু যারা দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করে পয়সার লোভে—

দ্বিতীয় গুলি বাঁ কানের পাশে—

ফেলু তারা টাকা দিয়ে রেহাই পায়না, মগনবাবু!

এবার পর পর চারটে গুলি মগনলালের মাথাকে ঘিরে একটা অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে।

মগনলাল ঠিক লালমোহনের মতোই অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে। ইন্‌স্পেক্টর তেওয়ারি ও দুজন পুলিশ তাকে লুফে নেয়।

লাল Grandfather কে লিয়ে brandy আউর গরম দুধ লাও!

দৃশ্য ১০

GHOSAL'S RESIDENCE / AMBIKA'S ROOM / NIGHT

অম্বিকা, উমানাথ, রুকু, তোপ্‌সে, লালমোহন বসে আছে; ফেলু এখনও অনুপস্থিত। টেবিলের উপর রাজভাণ্ডারের মিষ্টির হাঁড়িটা রয়েছে। সেটার এখনো সদ্ব্যবহার

হয়নি সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ফেলুর দেরি দেখে সকলেরই একটা উশখুশে ভাব। কেবল লালমোহন রুকুর বইয়ে (জটায়ু-লিখিত) হাসিমুখে সই করছে।

লাল এই নাও— আরো দুখানা বই তোমাকে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেব।

রুকু মহা খুশি।

উমা (তোপ্‌সেকে দেখিয়ে) আর ইনি কে জানত? ইনি ক্যাপ্টেন ফেলুর অ্যাসিস্ট্যান্ট।

রুকু তোমার নাম কী?

তোপ্‌সে ক্যাপ্টেন তোপ্‌সে।

অম্বিকা কিন্তু ক্যাপ্টেন ফেলু এত দেরি হচ্ছে কেন সেইখানেই ত ভাবনা। (লালমোহনকে) উনি আসবেন ত?

লাল হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি। মেক আপ তুলে সাজপোযাক পরে আসতে হবে ত

অম্বিকা গণেশটা পেয়েছেন ত?

ফেলুর প্রবেশ।

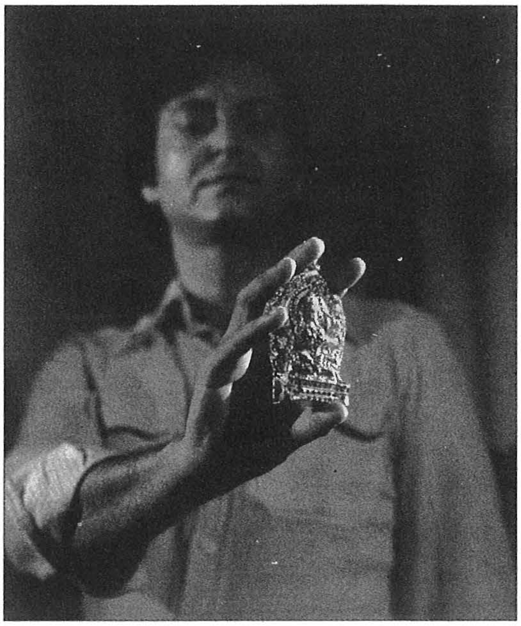

ফেলু এত কাঠখড় পুড়িয়েও গণেশ পাব না? এই নিন—

ফেলু পকেট থেকে গণেশটা বার করে অম্বিকার হাতে তুলে দেয়।

ফেলু একটা কাজ সেরে আসতে হল বলে দেরি হয়ে গেল।

অম্বিকা যাক্ বাবা—

অম্বিকা গণেশটা নিয়ে উঠে পড়ে। দেরাজ খুলে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে গণেশটা রেখে দেয়।

অম্বিকা আপনি যা খেল দেখালেন— এ জানতুম শুধু গল্পেই হয়। ... তাহলে এবার একটু মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে যাক্। অবিশ্যি তার আগে একটা কাজ আছে— আপনার পারিশ্রমিক।

ফেলু সেটার কথা ভাবছিলাম—

অম্বিকা ভাবছিলেন কেন - লজ্জা না করে বলে ফেলুন। আমি চেক বই বার করে রেখিচি।

ফেলু চেক লেখার আগে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

অম্বিকা একশোবার। অনুমতি আবার কি।

ফেলু তাহলে দেখুন। খুব মন দিয়ে দেখুন।

ফেলু ~~উঠে গিয়ে আবার দেরাজটা খোলে।~~

ফেলু এই আমি দেরাজ খুললাম।

ফেলু বাকি কাজগুলো করার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে যায়।

ফেলু এই চাবি বার করলাম। ... আর এই সিন্দুক খুললাম ... আর এই হল—

ফেলু গণেশটা বার করে।

ফেলু — আমার পারিশ্রমিক।

ঘরের সকলে থ। অম্বিকাও হতভম্ব। ফেলুর ঠোঁটের কোণে হাসি।

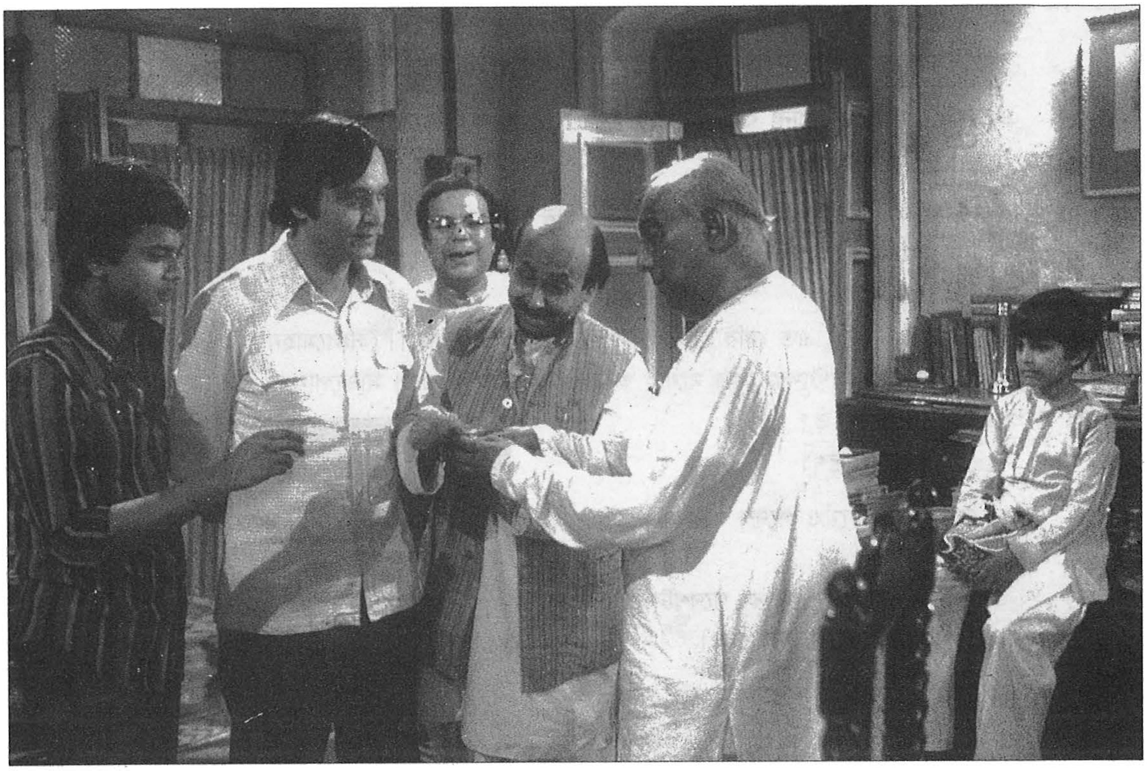

ফেলু আপনি গোয়েন্দা উপন্যাস গুলে খেতে পারেন, মিস্টার ঘোষাল, কিন্তু ভুলবেন না যে আমি নিজে গোয়েন্দা— আমাকে ঠকানো সহজ নয়!

অম্বিকার মুখ এখনো হাঁ।

ফেলু আমি যাচাই করে এলাম মিস্টার ঘোষাল— এটার দাম দুহাজারের বেশি নয়। এটা আসল গণেশ হলে আপনি নাতির সঙ্গে ফন্দী করে এটাকে সিংহের মুখে রাখতে পারতেন না। আমার ধারণা আসলটা আপনার ব্যাঙ্কে— তাই কী?

অম্বিকা সেতো রাখতেই হবে! বার বার লোকে দেখতে চায়— একটা work of art— এত দাম।

ফেলু তাহলে এটা আমি নিই?

অম্বিকা নেবেন বৈকি! - যার এত বুদ্ধি তার সিদ্ধি হবে না ত কার হবে?

রুকু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

রুকু ক্যাপ্টেন ফেলুর মগজাস্ত্র!

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতের ক্যাপ পিস্তলটা fire করে।

দেখা যায় সেই সঙ্গে আবার ঘাটের বুরুজ থেকে পায়রা উড়ে গেল।

এবারেও বুরুজের উপর Camera Zoom করে দেখা গেল তাকে লেখা রয়েছে—

সমাপ্ত

চিত্রনাট্যে পাণ্ডুলিপির বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

ফোটো : সন্দীপ রায়

মানুষের ইতিহাস

মনীশ ঘটক

(পারশ্য দেশীয় আখ্যান হইতে)

নতুন সিংহাসনে বসেই, রাজা দেশে যত বড় বড় পণ্ডিতদের এক মস্ত সভা আহ্বান করে বল্‌লেন,— দেখুন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস আমায় একখানা তৈরী করে দিতে হবে। সময় যত লাগে লাগুক্— কিন্তু কিছু যেন বাদ না যায়। একেবারে নিখুঁত চাই।

কুড়ি বছর পরে একদিন, পণ্ডিতেরা রাজদরবারে এসে হাজির হলেন। পেছনে বারোটা উটের পিঠে পাঁচশোখানা করে কেতাব!

দলপতি কিছুক্ষণ বক্তৃতা ক'রে, সেই ছ-হাজার পুঁথি রাজার সাম্‌নে ধরে দিলেন!

রাজা রাজকার্য্যে গলদ্‌গর্ম্ম— ইতিহাসের বহর দেখে তাঁর ত চক্ষুস্থির! বল্‌লেন— দেখুন, যৌবন ত অনেক দিন পেরিয়েছি— এই ছ'হাজার বই পড়্‌বার সময় এ জীবনে হওয়া অসম্ভব। কিছু বাদসাদ দিয়ে বইগুলো একটু ছোট করে আন্‌তে পারবেন না?

—আজ্ঞে হাঁ! নিশ্চয় পারব!

পণ্ডিতেরা বিদায় নিলেন।

আরো কুড়ি বছর গেল। অনেক পরিশ্রমের পর পণ্ডিতেরা ছ'হাজারকে কমিয়ে পনরশো দাঁড় করিয়ে, তিনটে উটের পিঠে বোঝাই করে রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা বল্‌লেন— হ্যাঁ, তা কমেছে বটে, কিন্তু আমার বয়স সে অনেক বেড়ে গেছে। দেড়হাজার বই পড়্‌বার সময় কি হবে? যদি পারেন তবে আরো কিছু ছোট করে আনুন।

দশ বছর পর পণ্ডিতেরা আবার হাজির— একটা বাচ্চা হাতীর পিঠে পাঁচ্‌শো বই চড়িয়ে।

রাজা বুড়ো হয়ে গেছেন। বল্‌লেন,— আমার মরবার ত আর বেশী দেরী নেই। আরো সংক্ষেপ করুন।

পাঁচবছর পর একজন পণ্ডিত, হাতে একখানা বই নিয়ে লাঠি ভয় দিয়ে রাজবাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন।

একজন রাজকর্ম্মচারী বল্‌ল,— ও, সেই ইতিহাস? তা, শীগ্‌গির করুন — রাজা মৃত্যুশয্যায়—

পণ্ডিত রাজার বিছানার কাছে যেতেই রাজা বল্‌লেন, —হায়! —মানুষের ইতিহাস না জেনেই আমায় মর্‌তে হল!

বুড়ো পণ্ডিত বল্‌লেন— না না— আমি তিন কথায় সে ইতিহাস আপনাকে বল্‌ছি! মানুষ জন্মে— কষ্টভোগ করে— তারপর মরে!

বানান অপরিবর্তিত

পুনর্মুদ্রণ-অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

ছোট্‌কার নতুন বাড়ি

অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ছোট্‌কাকে নিয়ে ভারী সমস্যা হয় মধ্যে মধ্যে। যেমন, সেবার ভরা শীতে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ নিপাত্তা তিনি। প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি কেউ — ও রকম হামেশাই করেন যে! তো, নয়-নয় করে হপ্তা দুয়েক পেরিয়ে যাওয়ার পর সবার টনক নড়ল। শুরু হল খোঁজ। কেষ্ট নগরে বন্ধুর বাড়ি। বর্ধমানে মামাতো ভাইয়ের বাড়ি। হাতিমপুরে ছোটকা-র স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। মানে, যেখানে যেখানে তিনি যেতে পারেন, সব জায়গা খোঁজা হল — নো পাত্তা।

শেষে, প্রায় দেড় মাস পর, শীত যখন পালাই পালাই করছে, তখন একদিন ভোর রাত্তিরে সশরীরে তিনি এসে হাজির। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল, খানিক ছিঁড়েও গেছে। চোখ দু'খানা পাকা করমচার মতো লাল। কোনও কথা না-বলে, তিনি দিব্যি ঘুমিয়ে নিলেন ঘণ্টা চারেক নিজের ঘরে গিয়ে। তারপর হাই-ওঠা মুখের সামনে তুড়ি মারতে মারতে বললেন, 'দেবদর্শন করে এলাম, বুঝলি। সাক্ষাৎ প্রকৃতি-ভগবান! অ্যায়সা ঠান্ডা হিমালয় — উঃফ্!'

বোঝো! কলেজের পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল চাপিয়ে হিমালয়!

তো, সেই ছোট্‌কা যখন হুট্ করে একখানা বাড়ি কিনে বসলেন, ঠাম্মি থুত্থুড়ে গলায় বললেন, 'বোম্বেটে-আকাট বোম্বেটে! কোনওদিন মানুষ হল না ছোটটা। আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে'... না—

ঠাম্মির ও বিশেষণ বলা যাবে না। হাজার হোক কাকা। আসলে যে-বাড়ি নিয়ে অত কাণ্ড, সেখানি নাকি হানাবাড়ি! ভাঙা জিরজিরে- হাড়গোড় বার করা। অনেকদিন কেউ ছিল না সেখানে। জায়গাটা সেদাপুরের কাছাকাছি, গঙ্গার ধারে। ছোট্‌কার যুক্তি, 'এই ধাপ্‌ধাড়া গোবিন্দপুর থেকে রোজ রোজ কলেজ করা যায়!'

ঠিক। ছোট্‌কা বলছেন যখন একডালিয়া পার্কও তখন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর!

এই হপ্তাখানেক আগে ছোট্‌কা এসেছিলেন। ভারী অভিমান করলেন, 'কেউ না-যাক, তুই তো যেতে পাত্তিস টুকলু। পরীক্ষা শেষ তোর...'

কথাটা ঠিক। কদিন ভারী একঘেয়ে লাগছিল। পরীক্ষা ফল বেরোতে এখনও বেশ কয়েক মাস। তাই-যা হয় আর কী গুচ্ছ গুচ্ছ গল্পের বই। আর সন্ধে হলেই কম্প্যুটর ক্লাস। নয়তো খেয়ে দেয়ে স্রেফ নাকে সর্ষের তেল — বেমক্কা ঘুম।

তাই ঠিক হল ছোট্‌কার নতুন বাড়িতে যাব। তো একা নয় পাশের বাড়ির গিগাও যাবে। আমরা সঙ্গেই পড়ে গিগা। ভৌত বিজ্ঞানে যা -তা সব মডেল বানায় সে। ঘরে বসে বসেই। তবে কিনা অঙ্কে ঠিক পেরে ওঠে না আমার সঙ্গে।

তা যাক গে যাক। ওসব পড়াশোনার কথা ভুলে এই রোববার কাগভোরে আমরা সোজা গিয়ে হাজির ছোট্‌কার নতুন বাড়িতে। ছোট্‌কা বললেন, 'এই রে! আজই এলি তোরা— আর এদিকে আজ যে আমায় একবার শক্তিগড় যেতে হচ্ছে—'

বললাম, 'শক্তিগড় কেন ছোট্‌কা'?'

'আর কেন? বুঝতেই তো পারছিস - রাধুটা খুব করে ধরেছে, জানিস — ওদের ওখানে ল্যাংচা খাওয়ার নেমন্তন্ন।'

গিগা আর আমার জোড়া হাঁ!

খানিক হেসে ছোট্‌কা বললেন, 'তবে চিন্তা করিস না, আজকের দিনটা কোনোরকমে কাটিয়ে দে। কাল ভোরেই ফিরব আমি। আর তাছাড়া ঝগড়ু রইল— ফার্স্ট ক্লাস চিলি-চিকেন বানায় ও।

তারপর ছোট্‌কা হুস্ করে বেরিয়ে গেলেন কোথায়। যখন ফিরলেন তাঁর দু'হাত ভর্তি গুচ্ছের খেলনা। ঝগড়ুর হাতেও। আমার জন্য। গিগার জন্য। আমার ভাইবোন সবার জন্য। মায় রাঙাকাকার ছোটমেয়ে তিতিনের জন্য কয়েকটা বেলুন অব্দি।

বাড়িখানি কিন্তু সত্যিই বড়ো। ইয়া ইয়া ইঁটের থাম। একতলা দোতলা মিলিয়ে দশ-বারোটা ঘর। সার সার ঘরগুলোর সামনে লোহার রেলিং দেওয়া লম্বা বারান্দা। দোতলার তিনখানা ঘর অপাতত পরিষ্কার করানো হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো ঘরখানায় ছোট্‌কার সার সার

বইয়ের আলমারি। শোবার পালঙ্ক। পড়ার টেবিলচেয়ার। পাশের ঘরে ঝগড়ু থাকে। আর তার পাশের ঘরে রান্নাবান্নার সরঞ্জাম।

ছোট্কা বই খেলনা সব ডাঁই করতে করতে বললেন, 'আজ তোরা এ ঘরেই থাক। ঝগড়ু কাজের ফাঁকে পাশের ঘর পরিষ্কার করে ফেলবে।'

সারাটা দিন বেশ কাটল। সকালের দিকে সারা বাড়ি চষে বেড়ালাম দু'জনে। ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ছাতে। আবার এক তলায় কখনও। বাগানে। জংলা গাছের মধ্যে বেশ কিছু দরকারি গাছও রয়েছে। ফল্সা-আঁশফল-সবেদা। আমগাছ গোটা তিনেক। একটা কাঁঠাল। এসব বাড়ির পেছনে, অর্থাৎ সদর রাস্তার দিকে। সামনে খানিক পরিষ্কার করিয়েছেন ছোট্কা। ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। আর ডানদিকে কলার ঝাড়। সেসব টপকে গেলেই সিঁড়ি। সোজা নেমে গেছে গঙ্গায়। ঘাটে বসতে বেশ লাগে। তবে, তখন কী আর জানতাম রাত বিরেতে এ সবই পালটে যাবে বেমালুম!

যাকে গে। সে পরের কথা পরে।

তোলা জলে চান না করে আমরা ঘাটে নামলাম। ঝাঁপাই ঝুরলাম বেশ খানিক। আর দুপুরে খেতে বসে চক্ষুস্থির! কী কাণ্ড! এত সব করল কখন লোকটা? নারকেল দেওয়া ছোলার ডাল, আলু-পটল ভাজা থেকে শুরু করে মাট্ন-কাবাব, কষা মাংস হয়ে শেষ পাতে প্লাস্টিক চাট্নি অব্দি!

সর্ব্বনাশ! লোকটা মানুষ না অন্য কিছু?

তবে, আসল ঝামেলা শুরু হল সন্ধের পর।

সকালের দৌড় ঝাঁপের দরুণ ক্লান্ত ছিলাম। তার ওপর আবার ঝগড়ু মহারাজের এলাহি মেনু! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভামল ঝগড়ুদার ডাকে। বাইরে সন্ধে নামছে তখন ঝুপঝুপ করে। খেয়াল হল ফ্যান ঘুরছে না। লোড্শেডিং। তবে ঝিরঝির বিষ্টি পড়ছে। পাতায় জল পড়ার শব্দ। আর ভিজে মাটির বাস।

ঝগড়ুদা বলল 'তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিন আপনারা। রাতে চোখে বিশেষ ঠাহর হয় না আমার।' দু'খানা হারিকেন টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল সে।

আর গিগা রেগে টং! 'এ তো বেড়ে ঝামেলা! একে অন্ধকার, তারপর আবার বলে কিনা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বলে দুপুরের খাবারই এখনও হজম হয়নি।'

আটটার মধ্যেই খাবার দিয়ে গেল ঝগড়ু। অল্পস্বল্প খেয়ে নিয়ে আমরা ছোট্কার আনা অঙ্কের ফ্যালাসি বইটা নিয়ে বসলাম। চাপ চাপ অন্ধকার তখন বারান্দায়। বাগানে। বাড়ির চতুর্দিকে। এক কণা আলো নজর পড়েনা কোথাও। ঠিক যেন নিঝুমপুরী। অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে। বাইরে চাইলেই গা ছমছম করে। ভয় হয়।

বেশ ডুবে গিয়েছিলাম দু'জনে। কয়েকটা ফ্যালাসি ভারী মজার। থই পাওয়া যায় না। তবে পাঁচকে শূন্য করার চালাকিটা প্রথমেই ধরে ফেললাম আমি। শূন্য দিয়ে আবার ভাগ করা যায় নাকি!

ঠিক তখনই আলো জ্বলল। সঙ্গে সঙ্গে গিগার চিৎকার, 'হুররে! এই জন্যই বোধহয় আলো আসছিল না রে টুকলু!'

গিগার কথা শেষ হতেই শব্দটা প্রথম কানে এল। খর-র খর, খর-র খর— যেন ছাদে ঝাঁট দিচ্ছে কেউ। গিগা বলল, 'কী কাণ্ড দেখছিস তোর ঝগড়ুদার! আমাদের পেট পুরে খাইয়ে-দাইয়ে বাবু এখন ছাদে উঠেছেন! ঝাঁট দিতে! আর বলে কিনা রাতে চোখে দেখে না।'

ঘড়ির দিকে চোখ গেল। ফ্যালাসির প্যাঁচে পড়ে রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে। ছাদ ঝাঁট দেওয়া? এত রাতে? প্রথমে সন্দেহ, আর তারপরই ছোট্‌কার এই নতুন বাড়ির কথা মনে পড়ল। সর্বনাশ! বাড়িটা না হানাবাড়ি ছিল! অনেকদিন থাকেনি এখানে কেউ তবে কী ... তবে কী ... মুহূর্তে হিলহিলে ভয় শিরদাঁড়ায় টের পেলাম। উঠে দাঁড়ালাম ঝপ্ করে। বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিলাম, 'ঝগড়ুদা'—'

কোনও উত্তর নেই।

কোথায় গেল মানুষটা? সত্যিই কি ছাদে?

'দেখেছিস কারবার!' আমার পেছন পেছন গিগাও বেরিয়ে এসেছিল। 'তোর আওয়াজ পেয়েই ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করেছে।'

কিন্তু ঘরের ঢুকতেই আবার সেই আওয়াজ... খরর-খর, খরর খর...। ঘুরে দেখি গিগার মুখ কালো। সেও আবার শুনতে পেয়েছে ছাদে ঝাঁড়ু দেওয়ার আওয়াজ। আর তক্ষুনি ঝগড়ুদার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল কালো, তে ঢ্যাঙা। পিঠের কাছটা খানিক বাঁকা। একমাথা কুচকুচে কালো বাবরি চুল। আর চোখজোড়া কেমন যেন ঘোলাটে, ঢোকা ঢোকা, ভালোভাবে দেখা যায় না। তবে কী ...

ভাবতেই আবার সেই শিরদাঁড়ার ভয়!

এ কার কাছে রেখে গেল আমাদের ছোটকা!

ওকে পেলই বা কোথা থেকে? ওকি এ-বাড়িতেই ছিল? দুড়দাড় আওয়াজে চমকে উঠলাম। দেখি গিগা এক লাফে আবার বারান্দায়। পাশের ঘরের দরজায় সজোরে আওয়াজ করতে থাকে সে, 'ঝগড়ুদা— ও ঝগড়ুদা! — ঝগড়ুদা', চেঁচাতে থাকে।

ভয়টা এতক্ষণে সেঁদিয়ে গেছে গিগার মনে। আমারও। গিগার পেছনে আমিও তখন বারান্দায়। চোখ গেল ঘাটের কাছে, বাগানে। আর অমনি শিরদাঁড়ার সেই ভয় কুলকুল করে ওপরে উঠতে লাগল!

বাগানে একজন ঘোমটা-টানা বউ!

মাঝে মাঝে নীচু হয়ে খুঁজছে কী সব। আর-আর-সারা পৃথিবী জুড়ে অমানুষিক শব্দ- শন্‌শন্, শন্‌শন্, শন্‌শন্...

একবার চেঁচিয়ে উঠি শুধু : 'গি-গা! ঘা-ঘাটের ধারে কে রে!' তারপর কিচ্ছু মনে নেই আর।

চোখ মেলতে দেখি একজন ঝাঁটা গোঁফওলা মানুষ-ডাক্তারই হবে — খুব মনোযোগ দিয়ে স্টেথো নাড়াচাড়া করছে গিগার বুকে। পাশে ছোট্‌কা। আমায় চোখ খুলতে দেখে ছোট্‌কা বলল, 'কী ব্যাপার বল তো? দুই বীর পুরুষই বারান্দায় চিৎপাত! এ বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি না বানিয়েই ছাড়বি না মনে হচ্ছে! হয়েছিল কী?'

তখনই আবার সেই ঝাঁট দেওয়ার আওয়াজ। ভয়ে চোখ বুজে ফেলি আবার। কোনমথে বলি 'ওই -ওই তো আবার সেই শ-শব্দ!'

ছোট্‌কা' অবাক, 'কীসের শব্দ?'

'ঝাঁট দেওয়ার! শুনতে পাচ্ছ না?'

'ঝাঁট দেওয়ার?' মুখ গম্ভীর হয় ছোট্‌কার কী যেন ভাবার চেষ্টা করেন, বা শোনার। এদিক ওদিক তাকান। তারপর হঠাৎই সশব্দে হেসে ওঠেন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওধারে ডাঁই করা আমাদের খেলনাগুলো থেকে তিতিনের বেলুনটা তুলে নিয়ে আসেন। সর্ষে-পোরা বেলুনে ছনছন আওয়াজ করতে করতে বলেন, 'এই নে হাঁদারাম, তোর ভূতের ঝাঁটা! ফ্যানের হাওয়া পেয়ে বেলুন এদিকে থেকে ওদিকে, খরর-খর, খরর-খর। হাসালি যা হোক! তোরা আবার বিজ্ঞানের ছাত্র!'

ফ্যাকাশে মুখে বলি,'কিন্তু ওই ঘোমটা দেওয়া বউটা?'

'কোথায় তোর বউ- দেখাবি চ।' ছোট্‌কার জেদ চেপে গেছে তখন। তখনও বিষ্টির ছিট্ ছিট্। হাওয়া বইছে। সকালের ঝলমলে রোদ নেই। বারান্দায় বেরিয়ে আঙুল তুলে দেখাতে গিয়ে এবার একেবারে হা!

এ যে কলাগাছ! হাওয়ার তোড়ে এখনও মাথা নোয়াচ্ছে মধ্যে মধ্যে!

ছোট্‌কা বললেন, 'তোদের জন্য শক্তিগড়ের বোম্বাই ল্যাংচা এনেছিলাম। মনে হচ্ছে তোদের পেটে বায়ুবৃদ্ধি কেস্! কী বলেন ডাক্তারবাবু? অর্থাৎ নো ল্যাংচা, নো কাঁচাগোল্লা। স্রেফ মাগুর-গ্যাঁদালের ঝোল আর ভাত। এত ভিতুর ডিম তোরা! ছিঃ!'

ছবি : দেবাশীষ দেব

সাদাকালো ইস্কুল

শুভশ্রী ভট্টাচার্য

মুন্নিদের বাদামি কুকুর 'কোণঠাসা'-র দুটো সাদা-কালো বাচ্চা জন্মাল। পা আর চোখ ফুটতে তারা হামা দিয়ে নারকোলপাতার ছাউনির ফোকর থেকে বেরিয়ে এল। এদের মধ্যে যার গায়ে সাদা বেশি— তার নাম হল— এলি। আর তেল-চুকচুকে নধর ছানাটার নাম রাখা হল— তেলি। এলি তেলির জ্বালায় কোণঠাসা বেচারা ব্যতিব্যস্ত। কোথাও পালিয়ে বাঁচার জো নেই। দুধ শেষ খাওয়ার জন্য দুটোতে ঝুলোঝুলি করতে থাকে। কাপড়কাচার শানের ওপর উঠে তবে শান্তি— ওরা এত উঁচুতে চড়তে পারে না।

মুন্নি দেখল তাদের ইস্কুলে যাওয়ার বয়স পার হয়ে যায়, অথচ শিষ্টতা, সভ্যতা কিছুই শেখা হল না। নিতান্ত অভদ্রের মত ঠ্যাং তুলে হাই তোলে, নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দে লড়াই করে, সময়ে অসময়ে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে থাকে। তাই এক নির্জন দুপুরে মুন্নির ডেস্ক থেকে বের হল বর্ণপরিচয়, হাসিখুশি। চুপিসাড়ে চেয়ারে চড়ে ছিটকিনি খুলে মুন্নি গেল উঠোনে— উনুনের কাছে। নিভে যাওয়া উনুনের গরম ছাইয়ের ওপর এলি তেলি জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছিল। তাদের তুলে এনে সিঁড়ির জানলার তলায় বসাল মুন্নি। নিজে বসল জানলার তাকে। হঠাৎ কী মনে পড়াতে ছুটে চলে গেল কোথায়— ফিরে এল একটা স্কেল নিয়ে। এইভাবেই সেদিন দুপুরে মুন্নির 'সাদাকালো ইস্কুল' খুলল।

কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দেওয়াতে এলি যে বেশ বিরক্ত হয়েছে, তা বোঝাতে ভুরু কুঁচকে ও অন্য দিকে ফিরে বসল। তেলিটা এত মোটা যে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। মুন্নি নিজেই সবে পড়তে শিখেছে। ও থেমে থেমে পড়তে লাগল, 'গোপাল বড় সুবোধ বালক।'

দূর আকাশের কালো বিন্দুর মতো শান্ত চিলগুলো ভেসে যায় জানলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। দেখতে বেশ লাগে মুন্নির। এক চোখ বুঁজে দেখলে শিকগুলোর পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায় এগুলো, আবার বেরিয়ে আসে। দুচোখ খুলে থাকলে ওরকম হয় না। একটা চিল জানলার সীমানার বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কোনও না-কোনও দিক থেকে আরেকটা চিল ঢুকে পড়ে জানলার রঙ্গমঞ্চে। এখন সবে আড়াইটে— দিদিভাই কলেজ থেকে ফিরবে সে-ই পাঁচটায়।

হঠাৎ দুপুরের ঝিম্‌ঝিমে ভাবকে চুরমার করে দিয়ে কোণঠাসা কেমন যেন বেসুরে ডেকে উঠল। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য মুন্নি জানলা দিয়ে উঁকি মারল। এলিতেলি কোত্থেকে ছুটে এসে বোকার মতো ল্যাজ

নাড়তে লাগল। তাদের দৃষ্টি লক্ষ করে মুন্নি দেখল একটা বেড়ালছানা। ছো-ট্ট। এলিতেলিরও হাঁটুর বয়সি হবে হয়তো। রাগে, ভয়ে, দুঃখে রোঁয়া ফুলিয়ে কাঁপাকাঁপা ল্যাজ উঁচিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হঠছে। ছোট্ট একটা হাঁ করে ডাকতে চাইছে— কিন্তু আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা বোধহয় শুকিয়ে গেছে। কোণঠাসাও মুখটা নামিয়ে তার দিকে এগোচ্ছে। যেন তার মতলবটা বুঝে ফেলতে চাইছে। ওর দুচোখে সন্দেহ আর আদর খেলা করছে।

মুন্নি যেতেই এলিতেলি আর কোণঠাসা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। এলিতেলি এখন দস্তুর মতো সুবোধ। কিন্তু বেড়ালটা? হাত বাড়াতেই— ফ্যাঁস। বাপরে, কী দাপট! অবশ্য চুকচুক শব্দ করতে ওর মুখে চোখে একটু দ্বিধার ভাব ফুটে উঠল, আর ঘেঁটি ধরে তুলতেই এক্কেবারে ভিজে বেড়াল।

বাবা বলল, 'গোঁফের বাহার দেখেছিস? হুলই বা ছানা।'

মুন্নি তখন তাকে সাবান জলে ডেটল দিয়ে ধুচ্ছে আর বলছে, 'প্রথম দিনই ইউনিফর্মটা নোংরা করে ফেললি তো?' তাইতো! এরও তো মুখ আর ল্যাজ কালো— আর সারা গায়ে সাদাকালো ব্লকপ্রিন্ট। ঠাকুমা ওর নাম দিল 'মুখপুড়ি।' ছোড়দা পরীক্ষা করে বলল— 'এটা তো ছেলে গো!এর নাম হোক টিপু। দেখছ না কেমন টিপবোতামের মত গলা। আবার মেজাজটাও সুলতান গোছের।'

দিদিভাই ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। মুন্নির ইস্কুলের জন্য কলেজ থেকে চক এনেছে। কিন্তু মুন্নির দেখা নেই। দিদিভাই জানে প্রথমেই কোথায় খুঁজতে হবে। ঠিক তাই। সিঁড়িতে স্কুল জমে উঠেছে। একটি নয়, দুটি নয় তিন তিনটি ছাত্রছাত্রী। সব্বার সাদাকালো ইউনিফর্ম। দিদিমণি বড্ড ব্যস্ত এদের পড়ানোয়।

'বলো, হারাধনের চারটি ছেলে নাচতো ধিন ধিন
একটি মেলো আছাড় খেয়ে, রইল বাকি তিন'

'আসতে পারি দিদিমণি'?

কাচহীন আদ্যিকালের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে তার ওপর দিয়ে বেজায় গম্ভীরভাবে মুন্নি দেখল দিদিভাইকে। তারপর হাতের স্কেলটা দেয়ালে ঠুকে বলল, 'তোমার ইউনিফর্ম কোথায়?'

'এ-এক্ষুণি পরে আসছি দিদিমণি।'

'এবারকার মতন ছেড়ে দিলাম। আর যেন কোনওদিন এমন ভুল না হয়।'

দিদিভাইকে আলমারি খুলে ঘাঁটতে দেখে মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল,

'কী খুঁজছিস? যাঃ, দিলিতো সব ওলটপালট করে!'

'মা, বড়োপিসির দেওয়া সাদাকালো ব্লকপ্রিন্টের কাজ করা সালোয়ার কামিজটা কোথায় গো?'

'সেটা দিয়ে কী করবি এখন? এইতো জামা পালটালি।'

মাকে আর কিছু বলল না দিদিভাই। কারণ, এলিতেলি তো আর ছোট্টটি নয়— ক্লাস ওয়ান বলে কথা। তাদের ঘরে ঢোকানো এবং তাতে দিদিভাই-এর প্রশ্রয়। জানতে পারলে এক্ষুনি সুখের ইস্কুল লাটে উঠবে।

প্রতি রবিবার বিকেলে সাদাকালো ইস্কুলের এক্সকার্শন হত। মুন্নির ফ্রকের কাপড়ের টুকরো-টাকরা দিয়ে টিপুর ফ্রক তৈরি হত। এলিতেলির ল্যাজের ডগায় লাল ফিতে নীল ফিতের ফুল বাঁধা হত। টিক্‌টিক্ করে ল্যাজ নড়লে চমৎকার দেখাত। মুন্নির সামনের পকেটে বসত টিপু। ক্যাঙারুর বাচ্চার মতো পকেট থেকে মুণ্ডু আর থাবা দুটো বার করে মহা আরামে দৃশ্য দেখতে দেখতে যেত ও।

এইরকমই একদিন ডুবন্ত সূর্য একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেছে। ফাঁকফোকর দিয়ে রাঙা আলোর ছটা বেরিয়ে সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে। অন্যপ্রান্তের নীল আকশের গায়ে হালকা মেঘগুলো গোলাপি আবির মেখে ভেসে চলেছে। দিদিভাই বলল, 'আর নয়, এবার বাড়ি চল্ মুন্নি। বৃষ্টি আসছে কিন্তু।'

'আরেকটু চল না, এই বাদাম গাছটা অবধি।'

লরির লিক বাদামগাছটার পাশ দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে বিদ্যাধরপুর স্টেশনের দিকে চলে গেছে। একসার হাঁস কলরব করতে করতে বিভিন্ন রেখার নকশা এঁকে বাসার দিকে চলে গেল। কালো মেঘের খণ্ডটা ব্লটিং পেপারে কালির ফোঁটার মতো বাড়তে বাড়তে প্রায় সারা আকাশটা ঢেকে ফেলেছে। বড়ো বড়ো লাল-সবুজ পাতা মেলে বাদামগাছটাও ওদের মতো আকাশের দিকে চেয়ে আছে যেন।

সেই বাঁকের মুখটাতেই ঘটল সেই ঘটনাটা— যেটাকে রবার দিয়ে জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারলেই ভালো হত মনে হয়। একটা কুকুর— কী তার রং কেমন তার আয়তন— কিছু বুঝে ওঠার আগেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল ওদের দিকে। ওরা পড়ি-কী-মরি করে দৌড়ল বাড়ির দিকে। এদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। পেছন ফিরে দেখবার কথা মনেও এল না কারও। বাড়ি ঢুকে বকুনির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে

এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, ওরা জানতেই পারল না, ওদেরই একজন এই বৃষ্টিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে রইল ধানখেতে। যখন খেয়াল হল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। এলি আর ফিরল না কোনওদিন। তেলিটা মনমরা হয়ে ঘুরতে লাগল বনে বাদাড়ে। আগের সেই ফুর্তি আর নেই ওর।

দিদিভাইয়ের বিয়ে। তার তোড়জোড় চলছে। মুন্নি হবে নিত-কনে। কদিন ধরে মুখ ভার মুন্নির— গলার কাছটা ব্যথা ব্যথা। সবসময় দিদিভাই-এর ল্যাজ হয়ে পেছন পেছন ঘুরছে। সাদাকালো ইস্কুলে এখন ছুটি চলছে। কাল দিদিভাই আর বম্মার সঙ্গে শাড়ি কিনতে গেছিল মুন্নি। একটা সাদা জমির ওপর কালো সুতোর কাজ করা বালুচরি শাড়ি খুব পছন্দ হয়েছিল দিদিভাই-এর। কিন্তু বম্মা ওটা কিনতে দিল না— বিয়েতে নাকি সাদাকালো কিছু দিতে নেই। একটা লাল টুকটুকে বেনারসি কেনা হল। সেদিন ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল ওদের।

পরদিন ঘুম ভেঙে মুন্নি দেখল টিপু ওর গা ঘেঁষে গুটলি পাকিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেমন করে যেন মশারি তুলে ঢুকে পড়েছে। একটা ছোট্ট, নরম থাবা ওর আঙুলের ওপর রাখা। মুন্নি উঠতে ও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। উঁচু হয়ে আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে, গুটিগুটি রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল। কিছুদিন ধরে পাত্তা না দেওয়ার ফল। সন্ধেবেলা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, গড়াগড়ি খেয়ে গোটা দুই-আড়াই উচ্চিংড়ে শিকার করে নাম কেনার অনেক চেষ্টা করল টিপু। তবু মুন্নি খাওয়ার পর এঁটোকাঁটাগুলো আগের মতো নিজে হাতে খাওয়াল না। কোনওমত থালাটা ঝনাৎ করে নামিয়েই ছুটল দিদিভাই-এর তত্ত্ব সাজানো দেখতে। তোয়ালে দিয়ে টিয়া, শাড়ি দিয়ে প্রজাপতি, আরও কী কী সব ভালো ভালো জিনিস। সারারাত ধরে ও সাজানো দেখল বড়োদের বারণ না শুনে। টিপুর দিকে খেয়ালই ছিল না কারও। শুধু অনেক রাতে সবার খাওয়া-দাওয়া চুকলে মা কাঁটাকোঁটা দিয়ে মাখা ভাত খেতে দিল টিপুকে। টিপু ছুঁয়েও দেখল না। বীণামাসি ফোড়ন কাটল, 'বেশি মাছ পেলে বেড়ালেও কাঁটা বেছে খায়।' মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বেছেই বা খাচ্ছে কোথায়?'

পরদিন সকালে মাছ কুটতে বসে বীণামাসি বলল, 'কই গো বউদি, তোমাদের টিপুর কী হল? অন্যদিন তো মাছের গন্ধে পাগল হয়ে যায়। মাছ কোটার সময় সামনে এসে বসে থাকে।' তখন বাড়িময় খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। ঘরে নেই, উঠোনে নেই, কলতলায় নেই, সারা পাড়ার কোত্থাও নেই। ঠাকুমা বলল, 'আসলে গাল্লুর বিয়া হইতাসে দেইখ্যা টিপুরও মনে বিয়া করনের শখ হইসে। দেখিস অখন দুই দিন যাইতে না যাইতেই একখান টেঁপিরে লইয়া হাজির হইব।'

টিপুর চলে যাওয়ার আসল কারণটা বুঝল কেবল একজন। সে তখন সিঁড়ির জানলায় তাকে বসে, শিকের ফাঁক দিয়ে পা গলিয়ে অঝোরে কাঁদছে। কাকে পড়াবে সে এবার? হঠাৎ ওর কান্না থেমে গেল। ওর চোখ অনুসরণ করে দেখা গেল কুল গাছের সরু ডালে একটা দোয়েল পাখি দোল খাচ্ছে। পেটটা সাদা, পিঠটা কালো। কালো লেজটা ঝুলিয়ে ও যেন শিস দিয়ে দুলে দুলে নামতা মুখস্ত করছে, 'দুই এক্কে দুই, দুই দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়...।'

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

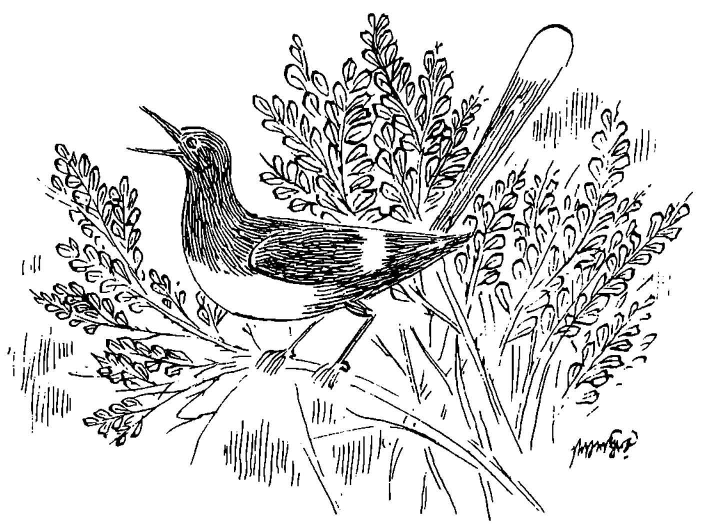

নন্দ গুপীর মন্দ কপাল
দিলীপ দাস
কিরে গুপী, তখন থেকে কচ্ছপের মতো গুটি গুটি করে পথ চলছিস কেন?
আমি ঠিকই চলেছি। ওই কচ্ছপের গল্প মনে আছে তো? শেষ পর্যন্ত কার জিত হয়েছিল?
ওটা ছিল খরগোশের অতি চালাকির ফল। আমি জেনেশুনে তা করতে যাবো কেন?
আউচ্!
উপস্, না দেখে এই কলার খোসাতে পাটা পরে গেছিল!
খামোখা তাড়াহুড়ো করার জন্যেই এমনটা হলো!
সময় মত কাজ না করাটা তোদের একটা আদত বনে গেছে। হুঁঃ।
এখনও তো সময় আছে, তাই বলছিলাম।
নাঃ, তোদের বোঝানো আমার কর্ম নয়, সুতরাং—
হেই বাবু সামালি কে!
অ্যাই!
নন্দ থাম্!

হায় রাম! এ মেরা কসুর নেহি!
কী কান্ড!
ওপস্!
তোর কপালটা ভীষণ রকম ফুলে উঠেছে! তখনই বলেছিলাম—
থাক, তোর আর কোনো কথা শুনতে চাই না।
নন্দ— সাবধান!
আমার সাবধানতা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।
যাঃ, যা ভেবেছি তাই—!
এখন আমি কী করি? দমকলে খবর দেবো না—
আরে, ওই তো উঠছে! ঐঃ, পাঁকে মাখামাখি!
আরে, ওটা আবার কী? ম্যানহোল থেকে নন্দর ডুপলিকেট মতো কি একটা উঠে আসছে!
আচ্ছা কাঁহিকা, ডিরেন মে কাম চলতা হায় দেখতা নেহি?
যাক ভৌতিক কিছু নয়! ম্যানহোলে কাজ চলছিল নন্দ তাতে পড়তেই জমাদার ফুঁসে উঠে নন্দকে তাড়া করেছে। নন্দর মন্দ কপাল!

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

অলস দিনের কাজ

জীবন সর্দার

বর্ষার শুরুতে কয়েকদিন বন্দি ছিলাম ঘরে। নড়াচড়া বারণ ছিল। কিন্তু চোখ মেলে দেখা কে আটকাবে! পুবের জানালা খুলে সেই অলস দিনে, ঝোপঝাড়ের দিকে চোখ আটকে রাখার কাজ পেয়ে গেলাম।

আগেই ঝোপের ভেতর বোলতার আনাগোনা লক্ষ করেছিলাম। কোনও গাছে তারা চাক বাঁধছে না কী! সহজে খুঁজে পাওয়া যেত ওদের একটির পিছু নিলে। সে উপায়ে ছিল না। অতএব কোনদিক থেকে এসে, কোন গাছের ঝোপের আড়ালে চলে যাচ্ছে, সেই দিকে নজর রেখে, সরু সবুজ-হলুদ ছিটের পাতাবাহার গাছের মাঝামাঝি একটি ডালে, বোলতা-চাকের ঠিকানা পেয়ে গেলাম। খুব বড়ো ছিল না। দিনে দিনে চাকটার আকার বাড়িয়ে তুলছে। কেমন করে সে বর্ণনা বড়ো একঘেয়ে হবে। বরং একটা মজার খবর জানাই।

বর্ষা মানেই 'ব্যাঙের ছাতা'

একদিন ঠিক দুপুরবেলা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। এমন হলে সবাই ঘরমুখো ছুট লাগায়। বোলতারা তাই করল। একটির পর একটি বৃষ্টিতে ডানা ভেজার পরোয়া না করে, দক্ষিণ দিকের ফাঁকা জায়গা ডিঙিয়ে, চাকটা ঢেকে বসল। বোলতা ডানা মেলে দিয়েই বসে। কিন্তু এই সময় এত ঘেসাঘেসি করে, ডানা চেপে ওরা বসেছিল, বৃষ্টি ফোঁটার সাধ্য ছিল না চাকটা ভেজায়। পাতা ভিজছে, গাছ ভিজছে, কিন্তু বোলতার চাক ভিজছে না। যতক্ষণ জল ঝরল। বোলতার দল (এতগুলি একসাথে আগে দেখিনি), ছাতার মতো বাসা ঢেকে বসেছিল।

বোলতার এমন আচরণ দেখে আমি তো অবাক। বোলতা এটা করেছে রীতিমাফিক। এরকম নানা রীতির কথা জানা যেত, দেখা যেত, যদি না ওই বাসা ছেড়ে বোলতার সেই ঝাঁক উধাও হয়ে যেত। সে তো আরও কিছুদিন বাদে। তার আগে ওই দিনের বৃষ্টির জমা জলে আর এক দৃশ্য দেখতে পেলাম। তবে সেদিন নয়।

সে ঘটনা একটি মশাকে নিয়ে। শুয়োঁপোকা যেমন খোলস পালটে একদিন মূককীট হয়ে যায়। মশার ছানারা কি তেমন করে? মূককীট হয়না, তবে 'পুতুল' অবস্থায় খোলস ছাড়ে। কেমন করে? যা দেখেছি তেমনি বলছি।

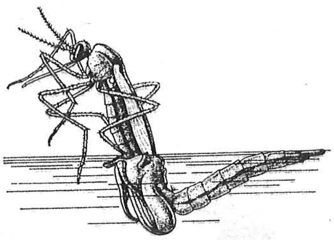

ওই যেদিন বৃষ্টি হয়েছিল সেদিনই ঝোপের ধারে, আমার নজর এলাকায় একটি ভাঁড়ে জল জমেছিল। তাতে মশা ডিম পেড়েছিল। ডিম থেকে মশার ছানা, তা থেকে আস্ত মশা কী করে বের হল— আমাকে অবাক করে?

আমার হাতের কাছে, চোখের নীচে যখন ভাঁড়টা পেলাম মশার পুটলিটা (নাকি পুতুলটা বলব) জলের তল বরাবর সোজা হয়ে ঝাঁকুনি খাচ্ছে। একবার দুবার নয় কয়েকবার। যতক্ষণ না পুটলিটার মাঝামাঝি ফেটে গেল। একে ফাটাফাটি কাণ্ড বলা যায়— কেননা দুই ফাটল দিয়েই বেশ মোলায়েম ভাবে একটি পূর্ণ মশা বের হয়ে এল। বের হয়ে নিজের খোলের উপরই বসে রইল তখন তার ডানা জোড়া একে একে মেলে দিয়ে, সামনের দু'পা দিয়ে মাথাটা বারকয়েক মুছে উড়ে গেল।

অল্প কয়েকটি কথায় আমি ঘটনার বিবরণ বুঝিয়েছি। আমি শুধু উপর উপর যা দেখেছি ভাসা ভাসা তাই বলেছি। কিন্তু আরও আছে। কতদিনে, কী করে মশাটি তার মায়ের

মতো বাবার মতো হয়ে উঠল সে খবর জানা না গেলে কিছুই জানা হলো না। আরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় সমস্ত প্রকৃতি-পড়ুয়া যদি একসঙ্গে ওই গবেষণায় নামে। তবুও হয়তো দশবছর বিশ বছর লেগে যাবে। একটি পোকার, মশার জীবন রহস্য জানা অনেক প্রাণীর উদ্ভিদেরও জীবন রহস্য জানার সূত্র খুঁজে দেয়। তাই অন্য কিছু দিকে নজর দিলাম। থেমে থাকা চলবে না।

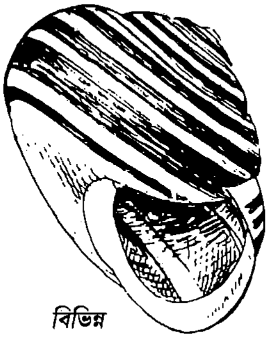

বিভিন্ন ধরনের শামুক

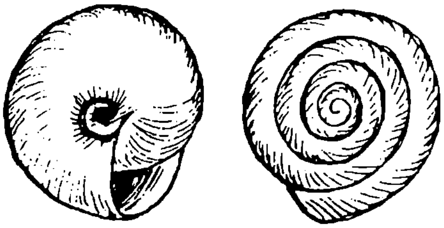

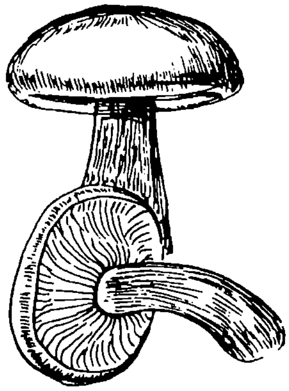

চাইছিলাম ঝোপের ভেতর থেকে একটা কি দুটো রহস্য বেরিয়ে আসুক। গতবছর এই ঝোপ-বাগানের মধ্যে কিছু শামুক ছিল। ব্যাঙের ছাতা ছিল। সে বছর এই সময়ে খুব বৃষ্টি ওদের জীবনে মজা দেখিয়েছে। এক থেকে অনেকানেক হতে দেখেছি। এবার বর্ষার দিনেও দারুণ গরম, সুখা সুখা ভাব। পচা পাতা ডালপালায় ছাতা ধরেনি। শামুকেরা ডুবে আছে মাটির ভেতর। জল জমলে তারা চলবে। আমি তাই পুরোনো ছবি ব্যাঙের ছাতার, শামুকের— বের করে দেখছি। চিনতে চেষ্টা করছি, আর ভাবছি কী নামে ওদের ডাকব। বাংলা নাম চাই। অলস দিনে এমন কাজ করেই কাটিয়েছি।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা : প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম রবিবার। বিকেল পাঁচটায়। সন্দেশ কার্যালয়ে। এদেশে এমন পাঠশালা একটাই।

---

৪৬ পৃষ্ঠার আইনস্টাইনের তৈরি ধাঁধার সমাধান

	১	২	৩	৪	৫
বাড়ির রং →	হলুদ	নীল	লাল	সবুজ	সাদা
বাসিন্দা কোন দেশের →	নরওয়েজিয়ান (নরওয়ের নাগরিক)	ডেন (ডেনমার্কের নাগরিক)	ব্রিটিশ	জার্মান	সুইডিশ
কোন→ সিগারেট খান	ডানহিল	ব্রেন্ড	পলমল	প্রিন্স	ব্লু মাস্টার
প্রিয় পানীয় →	জল	চা	দুধ	কফি	বিয়ার
কি পোষেন →	বিড়াল	ঘোড়া	পাখি	মাছ	কুকুর

তাহলে উত্তর দাঁড়াল যে মাছ পোষেন জার্মান ভদ্রলোক।

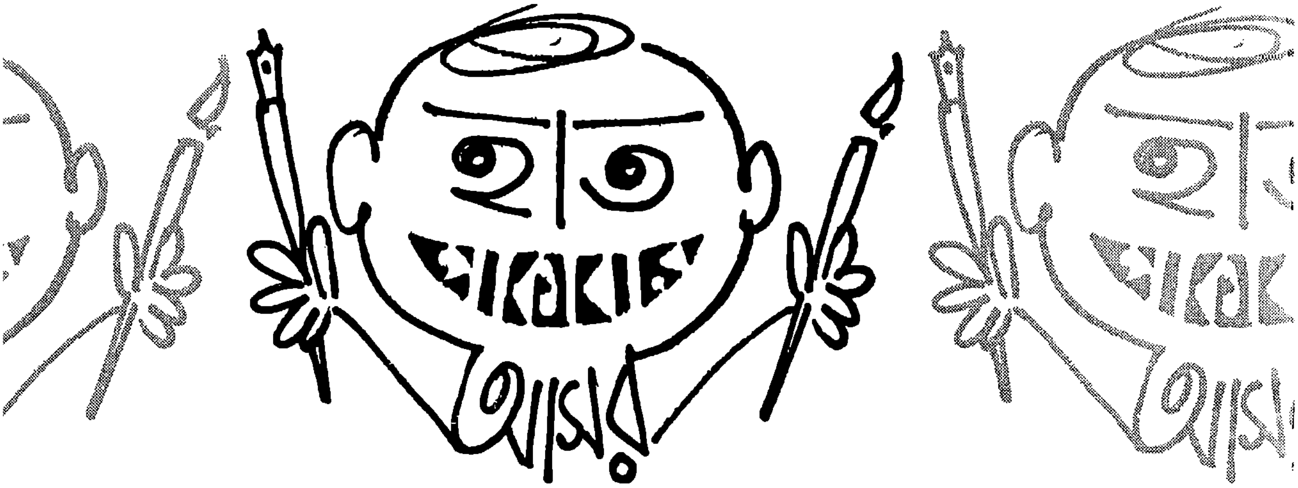

ঋকুর রামায়ণ

ঋক্ ধর্মপাল

গ্রাহক সংখ্যা : ৪১২১, বয়স : ৪

রাবণ সীতাকে নিয়ে গেছিল। তাই রাবণে রামে যুদ্ধ।

রাবণ সীতাকে বলল, 'আমাকে বিয়ে করো।'

সীতা বলল, 'এতো সুন্দর আমার রাজপুত্তুর তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আবার কেন বিয়ে করব?''

তখন রাবণ রেগে কাঁই।

তারপর রাবণ দেখে একটা বাঁদর। সে রাবণের সভায় এসে ল্যাজ পাকিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠে বলল।

—'তুমি সীতাকে না দিলে...'

রাবণ বলল, 'বাঁদরটার ল্যাজে আগুন জ্বেলে দাও।' তখন সবাই মিলে বাঁদরের ল্যাজে আগুন জ্বেলে দিল। হনুমান লাফাতে লাফাতে সারা ঘর আগুন করে দিল।

তারপর যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

আর রাম লঙ্কায় এসে সীতাকে নিয়ে গেল।

ভূতেদের কথা

সুশ্রুত চক্রবর্তী

গ্রাহক সংখ্যা : ৪০২৮, বয়স : ৯

কেওড়াতলায় রাত্রিতে আজ চতুর্থ ভূত-মিটিং,
ভূতরা এবার সইবে না আর মানুষগুলোর চিটিং।
মানুষরা সব খাচ্ছে বসে চপ কাটলেট ধোসা,
পিণ্ডে কেন দিচ্ছে না তা, তাই ভূতেদের গোঁসা।
যেসব হানাবাড়িগুলো ছিল ভূতের বাসা,
সেসব ভেঙে মাল্টিস্টোরিড উঠছে দেখ খাসা।
আবার দেখ প্রচার চালায়— ভূতেরা সব ফাঁকি;
ঘাড়ে চাপায় ভূতের কোনও কেরদানি নেই নাকি!
সবই এখন হিস্টিরিয়া, সবই এখন রোগ।
মধ্যে থেকে ভূতগুলোরই হচ্ছে যে দুর্ভোগ।
আগে যখন ভূত আসত তখন নিশুত রাতি,
এখন সারা রাত্রি ধরে জ্বলছে বিজলিবাতি।
তাই তো এসব ব্যাপারগুলোর খুঁজতে প্রতিকার,
ভূতেদের এই মিটিংগুলো হচ্ছে যে বারবার।

যখন স্লোগান উঠছে শুধু, ''মঁরুঁক মাঁনুঁষগুঁলোঁ''
সেই সময়ে কোথার থেকে আরেকটা ভূত এল।
তার মুখেতে ''আঁসছেঁ মাঁনুঁষ'' শুনেই সবাই মিলে,
নিজের নিজের বাসায় ঢুকে দরজা এঁটে দিলে।
আসল কথা, বর্তমানের অত্যাধুনিক যুগে,
মানুষরা নয়, ভূতরা এখন মানুষ ভয়ে ভাগে।

উত্তমদা ও মন্ত্রীর গাড়ি

সুদীপ্ত নাগ

গ্রাহক সংখ্যা : ৪১০০, বয়স : ১৪

আমি আর উত্তমদা আলোচনা করছিলাম সন্ত্রাসবাদীদের বিষয়ে। সেদিনের কাগজে বেরিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা হুমকি দিয়েছে যে তারা বিদ্যুৎ তৈরির জায়গাগুলো সব উড়িয়ে দেবে। তাই আমাদের হাওড়া সাব-স্টেশনের জন্যও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে।

উত্তমদা বলছিল 'যেসব গাড়ি এখানে ঢোকে, সেসব গাড়ির নাম্বার তখন টুকে রাখতে হচ্ছে। সই করাতে হচ্ছে, ডেট আর টাইম লিখতে হচ্ছে। ডিকি খুলে দেখতে হচ্ছে। এখন আমাদের অনেক কাজ, বুঝলে? বই পড়ার টাইম কমে গেছে।

আমি বললাম, 'এই করে কী তোমরা ঠেকাতে পারবে নাকি সন্ত্রাসবাদীদের? তোমাদের কাছে তো একটা বন্দুকও নেই। ডিকি খুলে সুটকেশ দেখলেই কী তোমরা বুঝতে নাকি তারমধ্যে কী আছে?

উত্তমদা পাকা গোয়েন্দার মতো বলল, 'ডিকি যখন খুলব তখন লোকগুলোর হাবভাব দেখেই বোঝা যাবে ওরা সন্ত্রাসবাদী না কী।'

উত্তমদার কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ির হর্ন শোনা গেল পিঁ পিঁ। উত্তমদা খাতা বগলে নিয়ে দৌড়োল। আমি ওকে অনুসরণ করলাম। ড্রাইভার বলল 'এক্ষুনি মন্ত্রীর গাড়ি আসছে। ওই গাড়িটা থামিয়ে আবার ভুল করে লেখাতে যেওনা। তাহলে নিজেই চাকরি খোয়াবে।'

উত্তমদা বলল, 'আমার ব্যাপার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। '

উত্তমদা গেট খুলে দিল। গাড়িও ঢুকে গেল।

পাড়ার ছেলে টুবুদা বলল 'এবার কী করবি উত্তম? এবার তো আর ওর কোন জারিজুরি খাটবে না। মন্ত্রীকে সই করালে সত্যিই তো চাকরি যাবে।'

উত্তমদা বলল, 'মন্ত্রীর গাড়ি আসবে তো কী এমন ব্যাপার? আতঙ্কবাদী এলে একটা কথা ছিল।

ঠিক এই সময় আবার গাড়ির হর্ন শোনা গেল। উত্তমদা খাতা নিয়ে ছুট লাগাল। উত্তমদা ডিকি খুলতে যেতেই একজন অফিসার ধমক লাগাল, 'জানোনা; এটা মন্ত্রীর গাড়ি!'

উত্তমদা তাতে কান না দিয়ে নিজের কাজ করে চলল। তারপর খাতাটা গাড়ির নম্বর লিখে সই করার জন্য ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে দিতেই ড্রাইভার খেঁকিয়ে উঠল, 'কথা কানে যাচ্ছেনা? মন্ত্রীমশাই ইচ্ছে করলেই তোমার চাকরি খেয়ে নিতে পারেন, জানো? যাও যাও তাড়াতাড়ি গেট খোলো।'

উত্তমদা বেশ কড়া গলায় বলল, 'দেখুন, সরকার যা নিয়ম করেছে তা আপনাদের মানতেই হবে। সে মন্ত্রীই হোক আর যাই হোক। '

টুবুদা আমাকে একটা চিমটি কেটে বলল, 'উত্তম কী করছে রে? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

আমিও ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। উত্তমদার কী হয় কে জানে! এখন তার সততার কথা কেই বা বোঝে? একজন অফিসার বলে উঠল, 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়!'

উত্তমদা বলল, 'ডিউটি ইজ ডিউটি।'

ড্রাইভার রেগেমেগে উত্তমদার জামার কলার ধরতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে এতক্ষণে মন্ত্রীমশাই কথা বললেন 'ও ঠিকইতো বলছে। বেকার বেকার ঝামেলা পাকাচ্ছ কেন? লিখে দিলেই চুকে যায়।'

অমনি ড্রাইভার লিখে দিল। উত্তমদাও গেট খুলে দিল। গাড়ি ঢুকে গেল। টুবুদা বলল, 'সত্যিই উত্তম, তোর এলেম আছে।'

উত্তমদা নির্বিকারভাবে বলল, 'দ্যাখো, এতে চাকরি যদি আমার চলে যেত তো চলে যেত। কিন্তু তাই বলে নিয়ম ভেঙে অন্যায় হতে দেখতে পারি না। এ আর এমন কী করলাম? যদি সন্ত্রাসবাদীরা আসত তাহলে একটা কথা ছিল। তাহলে দেখতে কীভাবে লড়তাম। প্রাণ যেত যেত কিন্তু ডিউটি ইজ ডিউটি।'

আমি উত্তমদার কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। যেখানে বড়ো বড়ো অফিসাররাও মন্ত্রীকে কিছু বলতে সাহস পায়না, সেখানে একজন সামান্য দারোয়ান হয়ে উত্তমদা মন্ত্রীকে যেভাবে নিয়ম মানতে বাধ্য করল, তাতে বুঝতে পারলাম যে, সে সন্ত্রাসবাদীরা এলে কীভাবে লড়ত।

'হাত পাকাবার আসর'-এ যারা গল্প, কবিতা বা ছবি পাঠাবে নাম, গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স লিখতে কখনই ভুলবে না।

ধাঁধা

জটা পাগলার সমস্যা

সামনেই অলিম্পিক। পটলা, হাবু আর ট্যাঁপাকে নিয়ে টিভিতে গত অলিম্পিকের বক্সিং ইভেন্টে একটা খেলা দেখছিলাম। একজন বক্সার ম্যাচ জিতেই দস্তানাপরা হাতদুটো শূন্যে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল। পটলা বলল, ‘জটুদা, তুমি কখনও বক্সিং লড়েছ?’

‘না, তবে বক্সারদের মোজা দস্তানা থাকতো আমার হেফাজতে। একটা বাক্সে দশ জোড়া সাদা মোজা আর দশ জোড়া কালো মজা থাকত। আর একটা বাক্সে থাকত ওই একই সংখ্যার কালো আর সাদা দস্তানা। আমাদের নিয়ম ছিল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একই রঙের মোজা আর দস্তানা পরে লড়বে। এবার বলতো একই রঙের মোজা আর দস্তানা পেতে হলে বাক্স থেকে কটা মোজা আরা দস্তানা তুলতে হবে।’

জুন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

জটা পাগলার সমস্যা : ঘণ্টায় ১২ কিমি।

কালাচাঁদের আঁকা ছবির ভুলগুলো হচ্ছে : (১) হেলিকপ্টার নেই (২) বাঁদিকের বাড়িতে একটা তলা বেশি (৩) একটা লোক নেই (৪) ফতুয়ার পকেটে কাগজ কম (৫) হাতে ঘড়ি নেই (৬) পায়ে চটি রয়েছে (৭) ছাগলের শিং নেই (৮) কুকুরের লেজ ভুল।

দাশু বলেছিল, ‘ভীষ্মলোচনের বংশধর’। আর কালাচাঁদ বলেছিল, ‘কানটা কটকট করে।’

শব্দ-সন্ধান

বর্ণবণিক

নীচে মোট ছ'টি সংকেত দেওয়া হল। এর প্রথম পাঁচটি সংকেত থেকে তৈরি হবে একটা করে পাঁচ বর্ণওয়ালা শব্দ। এবার প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণগুলিকে নীচের পাঁচটি গোলঘরে বসিয়ে দাও, ওইগুলোকে উল্টোপাল্টে দিলেই পাবে ষষ্ঠ সংকেতের উত্তর।

সেকেলে সিপাইদল বন্দুক হাতে					
লক্ষ্য গোপনে রাখা, সারা দিনরাতে					
আজেবাজে কথা বলে চলা অকারণে					
রাজা হলে বসতেই হবে এ আসনে					
সুন্দরবনে এই দেবের প্রতাপ					
	○	○	○	○	○
কী বা আর করা বলো, কপাল খারাপ					

গত সংখ্যার শব্দসন্ধান-এর উত্তর

● ঘনবসতি ● রংতামাশা ● জনবাহিনী ● সাক্ষীসাবুদ ● লটবহর ● জলসাঘর

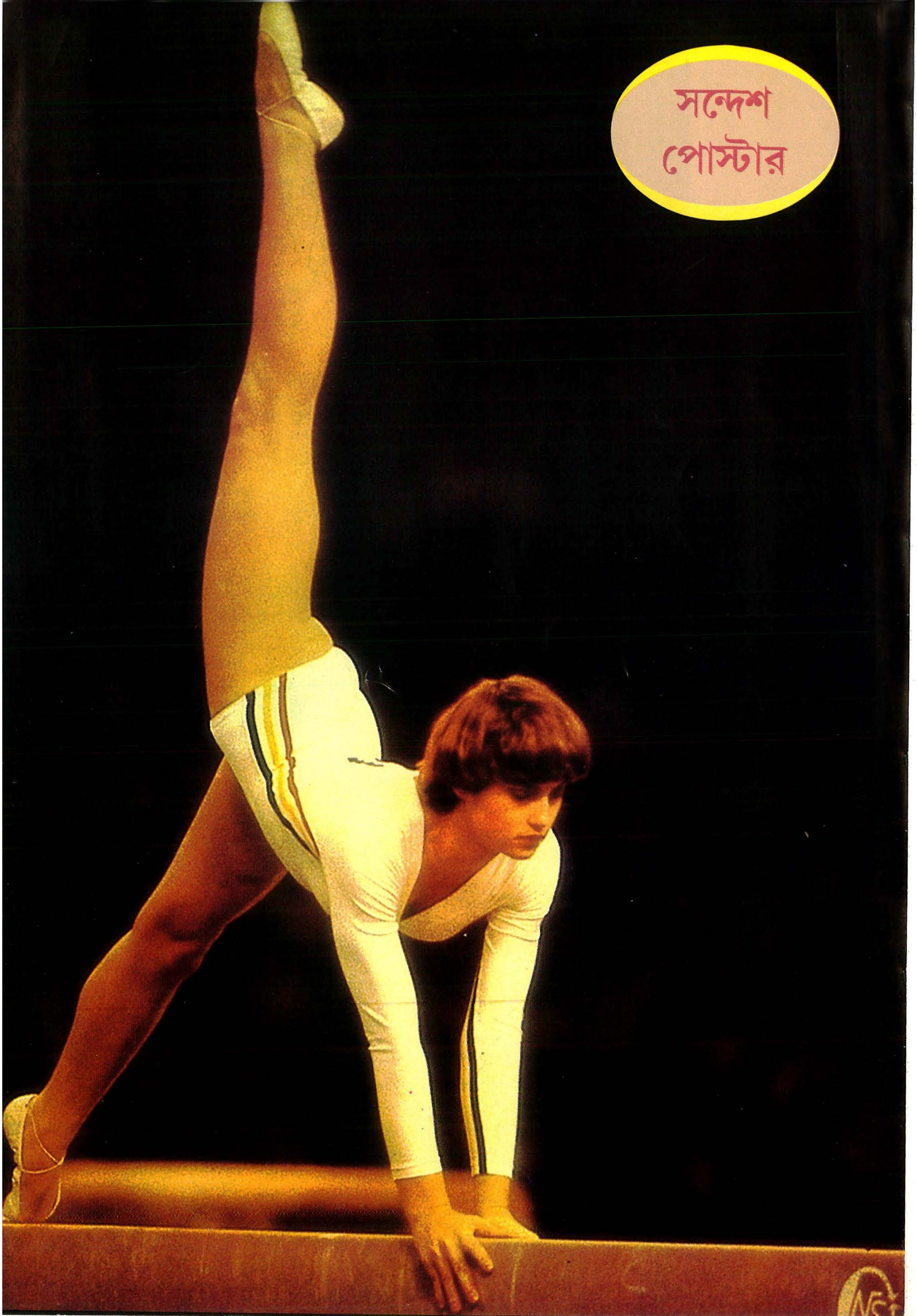
সন্দেশ
পোস্টার
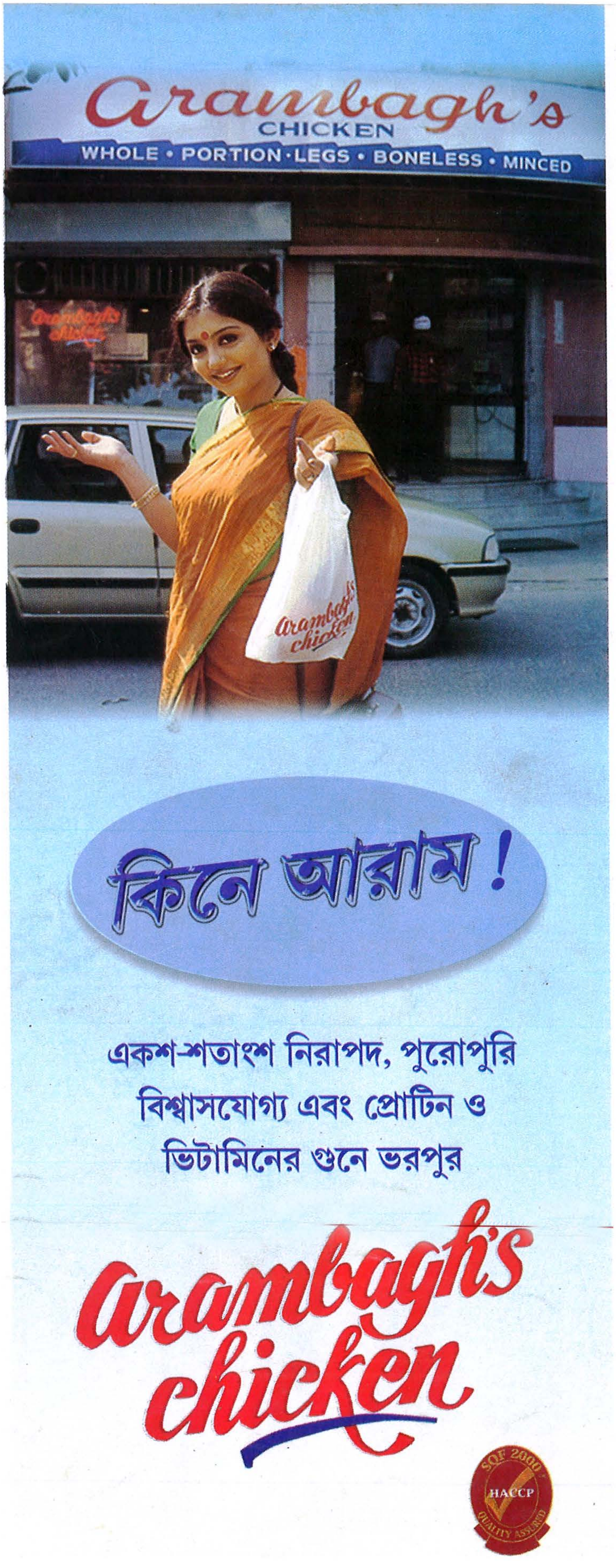
R.N.I No. 12007/64
Sandesh August 2004
Rs. 12